নাটক

রমা

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

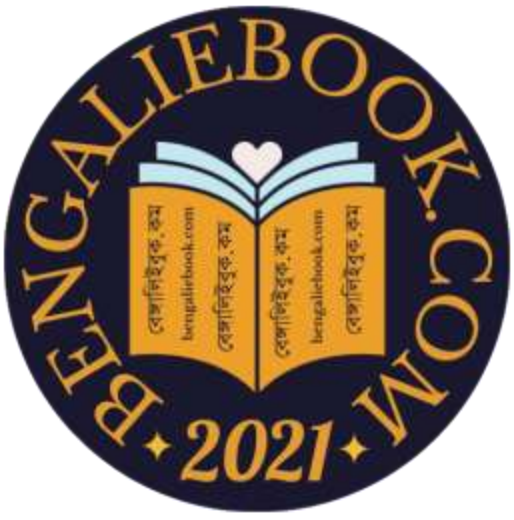

সূচিপত্র

1. নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ 3
2. প্রথম অঙ্ক 5
   - প্রথম দৃশ্য 5
   - দ্বিতীয় দৃশ্য 14
   - তৃতীয় দৃশ্য 40
   - চতুর্থ দৃশ্য 42
   - পঞ্চম দৃশ্য 52
3. দ্বিতীয় অঙ্ক 61
   - প্রথম দৃশ্য 61
   - দ্বিতীয় দৃশ্য 68
   - তৃতীয় দৃশ্য 76
   - চতুর্থ দৃশ্য 79
   - পঞ্চম দৃশ্য 90
   - ষষ্ঠ দৃশ্য 93
4. তৃতীয় অঙ্ক 102
   - প্রথম দৃশ্য 102
   - দ্বিতীয় দৃশ্য 112
   - তৃতীয় দৃশ্য 120

5. চতুর্থ অঙ্ক 125

- প্রথম দৃশ্য 125
- দ্বিতীয় দৃশ্য 134
- তৃতীয় দৃশ্য 138
- চতুর্থ দৃশ্য 145
- পঞ্চম দৃশ্য 148
-

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষ

বেণী ঘোষাল জমিদার

রমেশ ঘোষাল ঐ খুল্লতাত-পুত্র

মধু পাল মুদী

বনমালী পাড়ুই হেডমাস্টার

যতীন ... যদুনাথ মুখুয্যের কনিষ্ঠ পুত্র, রমার ভাই

গোবিন্দ গাঙ্গুলী

ধর্মদাস চাটুয্যে

ভৈরব আচার্য গ্রামবাসিগণ

দীননাথ ভট্টাচার্য

ষষ্ঠীচরণ

পরাণ হালদার

ভজুয়া রমেশের হিন্দুস্থানী দরোয়ান

গোপাল সরকার ঐ সরকার

দীনু ভট্টাচার্যের ছেলে-মেয়েরা, ময়রা, ভৃত্য, খরিদ্দারগণ, বাঁড়ুয্যে, নাপিত, যাত্রী, কর্মচারী, ভিখারিগণ, কুলদা, কৃষকগণ, আকবর, গহর, ওসমান, বৈষ্ণব, সরকার, সনাতন হাজরা, জগন্নাথ, নরোত্তম, দরোয়ান, ইত্যাদি।

স্ত্রী

বিশ্বেশ্বরী বেণীর মা

রমা যদু মুখুয্যের কন্যা

রমার মাসি, সুকুমারী, ক্ষান্ত, খেঁদী, নন্দর মা, ভিখারিণীগণ, বৈষ্ণবী, লক্ষ্মী, ইত্যাদি।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[যদুনাথ মুখুয্যে মহাশয়ের বাটীর পিছনের দিক। খিড়কির দ্বার খোলা, সম্মুখে অপ্রশস্ত পথ। চারিদিকে আম-কাঁঠালের বাগান এবং অদূরে পুষ্করিণীর বাঁধানো ঘাটের কিয়দংশ দেখা যাইতেছে। সকালবেলায় রমা ও তাহার মাসী স্নানের জন্য বাহির হইয়া আসিল এবং ঠিক সেই সময়েই বেণী ঘোষাল আর একদিক দিয়া প্রবেশ করিল। রমার বয়স বাইশ-তেইশের বেশি নয়। অল্প বয়সে বিধবা হইয়াছিল বলিয়া হাতে কয়েকগাছি চুড়ি ছিল, এবং থানের পরিবর্তে সরু পাড়ের কাপড় পরিত। বেণীর বয়সও পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশের অধিক হইবে না]

বেণী। তোমার কাছেই যাচ্ছিলেম রমা।

মাসী । তা খিড়কির দোর দিয়ে কেন বাছা?

রমা। তোমার এককথা মাসী । বড়দা ঘরের লোক, ওঁর আবার সদর-খিড়কি কি? কিছু দরকার আছে বুঝি? তা ভেতরে গিয়ে একটু বসুন না, আমি চট করে ডুবটা দিয়া আসি।

বেণী। বসবার জো নেই দিদি, ঢের কাজ। কিন্তু কি করবে স্থির করলে?

রমা। কিসের বড়দা?

বেণী। আমার ছোটখুড়োর শ্রাদ্ধের কথাটা বোন। রমেশ ত কাল এসে পৌঁছেছে। বাপের শ্রাদ্ধ নাকি খুব ঘটা করেই করবে। যাবে নাকি?

রমা! আমি যাবো তারিণী ঘোষালের বাড়ি!

বেণী। সে ত জানি দিদি, আর যেই কেন না যাক, তোরা কিছুতেই সে বাড়িতে পা দিবিনে। তবে শুনতে পেলাম ছোঁড়া নিজে গিয়ে সমস্ত বাড়ি-বাড়ি বলে আসবে। বজ্জাতি বুদ্ধিতে সে তার বাপের ওপরে যায়। যদি সত্যই আসে কি বলবে?

রমা। আমি কিছুই বলবো না বড়দা,—বাইরের দরোয়ান তার জবাব দেবে।

মাসী । দরোয়ান কেন লা, আমি বলতে জানিনে? নচ্ছার ব্যাটাকে এমনি বলাই বোলব যে, বাছাধন জন্মে কখনো আর মুখুয্যেবাড়িতে মাথা গলাবে না। তারিণী ঘোষালের ছেলে ঢুকবে নেমন্তন্ন করতে আমার বাড়িতে! আমি কিছুই ভুলিনি বেণীমাধব। তারিণী এই ছেলের সঙ্গেই আমার রমার বিয়ে দিতে চেয়েছিল। তখনো ত যতীন জন্মায় নি, ভেবেছিলো যুদু মুখুয্যের সমস্ত বিষয়টা তা হলে মুঠোর মধ্যে আসবে। বুঝলে না বাবা বেণী!

বেণী। বুঝি বৈ কি মাসী, সব বুঝি।

মাসী । বুঝবে বৈ কি বাবা, এ ত পড়েই রয়েচে। আর তা যখন হল না তখন ঐ ভৈরব আচায্যিকে দিয়ে কি-সব জপ-তপ, তুকতাক করিয়ে মায়ের কপালে আমার এমনি আগুন জ্বেলে দিলে যে, ছ'মাস পেরুল না বাছার হাতের নোয়া মাথার সিঁদুর ঘুচে গেল। ছোট জাত হয়ে চায় কিনা মুখুয্যের মেয়েকে বৌ করতে! তেমনি হারামজাদার মরণও হয়েছে। সদরে গেল মকর্দমা করতে আর ঘরে ফিরতে হল না। এক ব্যাটা, তার হাতের আগুনটুকু পর্যন্ত পেলে না। ছোট জাতের মুখে আগুন!

রমা। কেন মাসী, তুমি লোকের জাত তুলে কথা কও? তারিণী ঘোষাল বড়দারই ত আপনার খুড়ো। বামুন মানুষকে ছোট জাত বল কি করে? তোমার মুখে যেন কিছু বাধে না।

বেণী। (সলজ্জে) না রমা, মাসী সত্যি কথাই বলচেন। তুমি কতবড় কুলীনের মেয়ে, তোমাকে কি আমরা ঘরে আনতে পারি বোন? ছোটখুড়োর এ কথা মুখে আনাই বেয়াদবি। আর তুকতাকের কথা যদি বল ত সে সত্যি। দুনিয়ায় ছোটখুড়ো আর ভৈরবের অসাধ্য কাজ কিছু নেই। রমেশ আসতে না আসতেই ঐ ব্যাটাই ত জুটে গিয়ে হয়েছে তার মুরুব্বি।

মাসী । সে ত জানা কথা বেণী। ছোঁড়া বছর দশ-বারো ত দেশে আসেনি।—সেই যে মামারা এসে কাশী না কোথায় নিয়ে গেল আর কখনো এ মুখো হতে দিলে না। এতকাল ছিল কোথায়? করছিল কি?

বেণী। কি করে জানবো মাসী! ছোটখুড়োর সঙ্গে তোমাদেরও যে ভাব আমাদেরও তাই। শুনচি, এতদিন বোম্বাই না কোথায় ছিল। কেউ বলচে ডাক্তারি পাস করেচে, কেউ বলচে উকিল হয়েচে,—আবার কেউ বলচে সব ফাঁকি। ছোঁড়া নাকি পাঁড় মাতাল। যখন বাড়ি এসে পৌঁছল, তখন চোখ-দুটো ছিল নাকি জবাফুলের মত রাঙা।

মাসী । বটে! তা হলে ত তাকে বাড়ি ঢুকতে দেওয়াই যায় না।

বেণী। কিছুতে না। হাঁ রমা, তোমার রমেশকে মনে পড়ে?

রমা। (সলজ্জ মৃদু হাসিয়া) এ ত সেদিনের কথা বড়দা। তিনি আমার চেয়ে বছর-চারেকের বড়। এক পাঠশালায় পড়েচি, একসঙ্গে খেলা করেচি, ওঁদের বাড়িতেই ত থাকতাম। খুড়ীমা আমাকে মেয়ের মত ভালবাসতেন।

মাসী । তার ভালবাসার মুখে আগুন। ভালবাসা ছিল কেবল কাজ হাসিল করবার জন্যে। তাদের ফন্দিই ছিল কোনমতে তোকে হাত করা। কম ধড়িবাজ ছিল রমেশের মা!

বেণী। তাতে আর সন্দেহ কি। ছোটখুড়ীও যে–

রমা। দেখো মাসি, তোমাদের আর যা ইচ্ছে বল, কিন্তু খুড়ীমা আমার স্বর্গে গেছেন, তাঁর নিন্দে আমি কারও মুখ থেকেই সইতে পারবো না।

মাসী । বলিস কি লো? একেবারে এতো?

বেণী। তা বটে, তা বটে। ছোটখুড়ী ভালমানুষের মেয়ে ছিলেন। তাঁর কথা উঠলে মা আজও চোখের জল ফেলেন। তা সে যাক, কিন্তু এই ত স্থির রইল দিদি, নড়চড় হবে না ত?

রমা। (হাসিয়া) না। বড়দা, বাবা বলতেন আগুনের শেষ, ঋণের শেষ, আর শত্রুর শেষ কখনো রাখিস নে রমা। তারিণী ঘোষাল জ্যান্তে আমাদের কম জ্বালা দেয়নি–বাবাকে পর্যন্ত জেলে দিতে গিয়েছিল। আমি কিছুই ভুলিনি বড়দা, যতদিন বেঁচে থাকবো ভুলবো না। রমেশ সেই শত্রুরই ছেলে। আমরা ত নয়ই–আমাদের সংস্রবে যারা আছে তাদের পর্যন্ত যেতে দেব না।

বেণী। এই ত চাই। এই ত তোমার যোগ্য কথা।

রমা। আচ্ছা বড়দা, এমন করা যায় না যে কোন ব্রাহ্মণ না তার বাড়ি যায়? তা হলে–

বেণী। আরে, সেই চেষ্টাই ত করচি বোন। তুই শুধু আমার সহায় থাকিস আর আমি কোন চিন্তা করিনে। রমেশকে এই কুঁয়াপুর থেকে না তাড়াতে পারি ত আমার নামই বেণী ঘোষাল নয়। তারপরে রইলাম আমি আর ঐ আচায্যিব্যাটা। ছোটখুড়ো আর বেঁচে নেই, দেখি তাকে কে রক্ষা করে!

রমা। (হাসিয়া) রক্ষে করবেন বোধ করি রমেশ ঘোষাল। কিন্তু আমি বলে রাখলেম বড়দা, আমাদের শত্রুতা করতে ইনিও কম করবেন না।

বেণী। (এদিক-ওদিক চাহিয়া এবং কণ্ঠস্বর আরও মৃদু করিয়া) রমা, আসল কথা হচ্চে, বিষয়-সম্পত্তির ব্যাপার সে আজও কিছুই বোঝে না। বাঁশ নুইয়ে ফেলতে চাও ত এই সময়। পেকে উঠলে আর হবে না তা তোমাকে নিশ্চয় বলে দিচ্চি। দিনরাত মনে রাখতে হবে এ তারিণী ঘোষালের ছেলে আর কেউ নয়। চেপে বসলে আর–

[অন্তরাল হইতে গম্ভীর-কণ্ঠের ডাক আসিল,–"রানী কৈ রে?" রমা চকিত হইয়া উঠিল। এবং পরক্ষণেই দ্বারের ভিতর দিয়া রমেশ প্রবেশ করিল। তাহার রুক্ষ মাথা, খালি পা, উত্তরীয়টা মাথায় জড়ান। বেণীর প্রতি দৃষ্টি পড়িতেই–]

রমেশ। এই যে বড়দা এখানে? বেশ, চলুন। আপনি নইলে করবে কে? আমি সারা গাঁ আপনাকে খুঁজে বেড়াচ্চি। রানী কৈ? বাড়ির মধ্যে দেখি কেউ নেই। ঝি বললে এই দিকে গেছে–

[রমা নতমুখে দাঁড়াইয়া ছিল, সহসা তাহাকে পাইয়া]

রমেশ। আরে এই যে! ইস! কত বড় হয়েচো! ভালো আছো ত? আমাকে চিনতে পারচো না বুঝি? আমি তোমাদের রমেশদা।

রমা। (মুখ তুলিয়া চাহিল না, কিন্তু অত্যন্ত মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল) আপনি ভাল আছেন?

রমেশ। হাঁ ভাই ভাল আছি। কিন্তু আমাকে 'আপনি' কেন রানী? (বেণীর দিকে চাহিয়া) রমার একটি কথা আমি কোনদিন ভুলতে পারিনি বড়দা। মা যখন মারা গেলেন

তখন ত ও ছোট; কিন্তু তখনি আমার চোখ মুছিয়ে দিয়ে বলেছিল, তুমি কেঁদো না রমেশদা, আমার মাকে আমরা দুজনে ভাগ করে নেব। তোমার বোধ হয় মনে পড়ে না, না? আমার মাকে মনে পড়ে ত?

[রমা নিরুত্তর, লজ্জায় যেন তাহার মাথা আরও হেঁট হইয়া গেল]

রমেশ। কিন্তু আর ত সময় নেই ভাই। যা করবার করে দাও,—যাকে বলে একান্ত নিরাশ্রয় আমি তাই হয়েই আবার তোমাদের দোরগোড়ায় ফিরে এসে দাঁড়িয়েচি। তোমরা না গেলে এতটুকু ব্যবস্থা পর্যন্ত হয়ত হবে না।

মাসী । (কাছে আসিয়া রমেশের মুখের দিকে চাহিয়া) তুমি বাপু তারিণী ঘোষালের ছেলে না?

[রমেশ নিঃশব্দ বিস্ময়ে চাহিয়া রহিল]

মাসী । আগে ত দেখনি, চিনতে পারবে না বাছা,—আমি রমার আপনার মাসী । কিন্তু এমন বেহায়া পুরুষমানুষ তোমার মত আর ত দেখিনি। যেমন বাপ তেমনিই কি ব্যাটা! বলা নেই কহা নেই, একটা গেরস্তর বাড়ির অন্দরে ঢুকে উৎপাত করতে শরম হয় না তোমার?

রমা। কি বকচো মাসী, নাইতে যাও না।

[বেণীর নিঃশব্দে প্রস্থান]

মাসী । নে রমা বকিস নে। যে কাজ করতেই হবে তাতে তোদের মত আমার চক্ষুলজ্জা হয় না। বলি, বেণীর অমন কোরে পালানোর কি দরকার ছিল? বলে গেলেই ত হোত, আমরা বাপু তোমার গোমস্তাও নই, খাস-তালুকের প্রজাও নই যে, তোমার

কর্মবাড়িতে জল তুলতে ময়দা মাখতে যাবো। তারিণী মরেচে লোকের হাড় জুড়িয়েছে। এ কথাটা বলার বরাত আমাদের মত দুজন মেয়েমানুষের ওপর না দিয়ে নিজে বলে গেলেই ত পুরুষের মত কাজ হোতো।

[রমেশ নির্বাক পাথরের মূর্তির মত দাঁড়াইয়া রহিল]

মাসী । যাই হোক, বামুনের ছেলেকে আমি চাকর-বাকর দিয়ে অপমান করতে চাইনে, একটু হুঁশ করে কাজ কোরো। কচিখোকাটি নও যে লোকের বাড়িতে ঢুকে আবদার করে বেড়াবে। রানী কি? রানী ওর নাম নাকি? তোমার বাড়িতে আমার রমা কখনো পা ধুতে যেতেও পারবে না। এই তোমাকে আমি বলে দিলাম।

রমেশ। তোমাকে মা বলতেন রানী, ছেলেবেলার সেই ডাকটাই মনে ছিল রমা। আমি ত জানতাম না যে, আমাদের বাড়িতে তুমি যেতেই পারো না। না জেনে যে উপদ্রব করে গেলাম সে আমাকে তুমি ক্ষমা করো রমা।

[রমেশের প্রস্থান ও বেণীর আবির্ভাব]

বেণী। (তাহার সমস্ত মুখ খুশীতে ভরিয়া গিয়াছে) হাঁ, শোনালে বটে মাসী । আমাদের সাধ্যিই ছিল না অমন করে বলা। এ কি চাকর-বাকরদের কাজ রমা? আমি আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখলাম কিনা, ছোঁড়া মুখখানা যেন আষাঢ়ের মেঘের মত করে বেরিয়ে গেল। এই ত ঠিক হল।

মাসী । হল ত জানি, কিন্তু মেয়েমানুষের ওপর ভার না দিয়ে, না সরে গিয়ে নিজে বললেই ত আরো ভাল হতো। আর না-ই যদি বলতে পারতে, আমি কি বললাম দাঁড়িয়ে থেকে শুনে গেলে না কেন বাছা?

রমা। দুঃখ কোরো না মাসী, উনি না শুনুন আমরা শুনেচি। যে যতই বলুক না কেন, এতখানি বিষ জিভ দিয়ে ছড়াতে তোমার মত আর কেউ পেরে উঠত না।

মাসী । কি বললি লা?

রমা। কিছু না। বলি, রান্নাবান্না কি আজ হবে না? যাও না ডুবটা দিয়ে এসো না।

[পুষ্করিণীর উদ্দেশে রমার দ্রুতপদে প্রস্থান]

বেণী। ব্যাপার কি মাসী?

মাসী । কি করে জানবো বাছা? ও রাজরানীর মেজাজ বোঝা কি আমাদের মত দাসীবাঁদীর কর্ম?

[প্রস্থান

[গোবিন্দ গাঙ্গুলীর প্রবেশ]

গোবিন্দ। ভ্যালা যা হোক। সকাল থেকে সারা গাঁ-টা খুঁজে বেড়াচ্চি বেণীবাবু গেল কোথায়! বলি শুনেচ খবরটা? বাবাজী কাল ঘরে পা দিয়েই ছুটেছিলেন নন্দীদের ওখানে।

এ যদি না দু'দিনে উচ্ছন্ন যায় ত আমার গোবিন্দ গাঙ্গুলী নাম তোমরা বদলে রেখো। নবাবী কাণ্ড-কারখানার ফর্দ শোন ত অবাক হয়ে যাবে। তারিণী ঘোষাল সিকি পয়সা রেখে মরেনি তা জানি, তবে এত কেন? হাতে থাকে কর্, না থাকে বিষয় বন্ধক দিয়ে কে কবে ঘটা করে বাপের শ্রাদ্ধ করে তা ত কখনো শুনিনি বাবা। আমি তোমাকে নিশ্চয় বলচি বেণীমাধববাবু, এ ছোঁড়া নন্দীদের গদী থেকে অন্ততঃ পাঁচটি হাজার টাকা দেনা করেচে।

বেণী। বল কি! তা হলে কথাটা ত বার করে নিতে হচ্ছে গোবিন্দখুড়ো?

গোবিন্দ। (মৃদু হাস্য করিয়া) সবুর করো না বাবাজী, একবার ভাল করে ঢুকতেই দাও না। তার পরে নাড়ীর খবর ফেড়ে বার করে আনবো—তখন বুঝবে গোবিন্দ গাঙ্গুলীকে। এর মধ্যে অনেক কথাই শুনতে পাবে বাবাজী, অনেক শালাই লাগিয়ে যাবে,—কিন্তু চেনো ত খুড়োকে? সেইটুকু মনে মনে বুঝো, এখন আর কিছু ফাঁস করচি নে।

বেণী। রমার কাছে এসেছিলাম।

গোবিন্দ। তা জানি। কি বলে সে?

বেণী। তারা ত নয়ই, তাদের সম্পর্কে যে যেখানে আছে তারা পর্যন্ত নয়।

গোবিন্দ। ব্যস্! ব্যস্! আর দেখতে হবে না।

বেণী। কিন্তু তোমরা যে—

গোবিন্দ। উতলা হও কেন বাবাজী, আগে ঢুকি। উদ্যোগ আয়োজনটা একটু ভাল করে করাই, তখন না,—ছাদ্দ-গড়ানো কাকে বলে একবার বাইরে দাঁড়িয়ে দেখো!

বেণী। তবে যে শুনি—

গোবিন্দ। অমন ঢের শুনবে বাবাজী, অনেক ব্যাটা এসে অনেক রকম করে লাগাবে। কিন্তু গোবিন্দখুড়োকে চেনো ত? ব্যস্! ব্যস্!

[উভয়ের প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[রমেশের বহির্বাটী। চণ্ডীমণ্ডপের বারান্দার একধারে ভৈরব আচার্য থান ফাড়িয়া কাপড় পাট করিয়া গাদা দিতেছে। চণ্ডীমণ্ডপের অভ্যন্তরে বসিয়া গোবিন্দ গাঙ্গুলী ধূমপান করিতেছে এবং আড়চোখে চাহিয়া বস্ত্ররাশির মনে মনে সংখ্যা-নিরূপণ করিতেছে। কর্মবাড়ি। আসন্ন শ্রাদ্ধকৃত্যের বহুবিধ আয়োজন চারিদিকে বিক্ষিপ্ত। নানা লোক নানা কাজে ব্যস্ত। সময় অপরাহ্ণ]

[রমেশের প্রবেশ]

রমেশ। (গোবিন্দ গাঙ্গুলীর প্রতি সবিনয়ে) এই যে আপনি এসেচেন।

গোবিন্দ। আসবো বৈ কি বাবা, আসবো বৈ কি! এ যে আমার আপনার কাজ রমেশ।

[নেপথ্যে কাশির শব্দ। কাশিতে কাশিতে চার-পাঁচটি ছেলেমেয়ে লইয়া ধর্মদাস চাটুয্যের প্রবেশ। তাঁহার কাঁধের উপর মলিন উত্তরীয়, নাকের উপর একজোড়া ভাঁটার মত মস্ত চশমা পিছনে দড়ি দিয়া বাঁধা। সাদা চুল, সাদা গোঁফ তামাকের ধূঁয়ায় তাম্রবর্ণ। অগ্রসর হইয়া রমেশের মুখের প্রতি ক্ষণকাল চাহিয়া কোন কথা না কহিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। রমেশ চিনিল না ইনি কে। কিন্তু যেই হোন, ব্যস্ত হইয়া হাত ধরিতেই—]

ধর্মদাস। (কাঁদিয়া) না বাবা রমেশ, তারিণী যে এমন করে ফাঁকি দিয়ে পালাবে তা স্বপ্নেও জানিনে। কিন্তু আমারও এমন চাটুয্যে-বংশে জন্ম নয় যে কারু ভয়ে মুখ দিয়ে মিথ্যে কথা বেরুবে। আসবার সময় তোমার আপন জাঠতুতো ভাই বেণী ঘোষালের মুখের উপর কি বলে এলাম জানো? বললাম, রমেশ যেমন শ্রাদ্ধের আয়োজন করচে, এমন করা চুলোয় যাক, এ-অঞ্চলে কেউ চোখেও দেখেনি। আমার নামে অনেক শালা অনেক

রকম তোমার কাছে লাগিয়ে যাবে বাবা, কিন্তু এটা নিশ্চয় জেনো, এই ধর্মেরই শুধু ধর্মেরই দাস, আর কারও নয়।

[এই বলিয়া গোবিন্দর হস্ত হইতে হুঁকোটা ছিনাইয়া লইয়া
এক টান্ দিয়াই প্রবল বেগে কাশিয়া ফেলিলেন]

রমেশ। না না, বলেন কি, বলেন কি–

[প্রত্যুত্তরে ধর্মদাস ঘড়ঘড় করিয়া কত কি বলিলেন, কিন্তু কাশির ধমকে তাহার একটা বর্ণও বুঝা গেল না। গোবিন্দ সর্বাগ্রে আসিয়াছিলেন, সুতরাং এই নবীন জমিদারটিকে ভাল ভাল কথা বলিবার সুযোগ তাঁহারই ছিল, অথচ নষ্ট হইতেছে বুঝিয়া তিনি তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইলেন]

গোবিন্দ। কাল সকালে, বুঝলে ধর্মদাসদা, এখানে আসবো বলে বেরিয়েও আসা হল না। বেণীর ডাকাডাকি–গোবিন্দখুড়ো তামাক খেয়ে যাও। একবার ভাবলেম কাজ নেই,–তার পরে মনে হল ভাবখানা বেণীর দেখেই যাইনে। বেণী কি বললে জানো বাবা রমেশ, বলে খুড়ো, তোমরা ত দেখচি হয়েচ রমেশের মুরুব্বি, বলি লোকজন খাবে-টাবে ত? আমিই বা ছাড়ি কেন,–তুমি বড়লোক আছো না-আছো, আমার রমেশও কারো চেয়ে খাটো নয়। তোমার ঘরে ত একমুঠো চিঁড়ের পিত্যেশ কারু নেই। বললাম, বেণীবাবু, এই ত পথ–দাঁড়িয়ে একবার কাঙ্গালী-বিদেয়ের ঘটাটা দেখো। কালকের ছেলে রমেশ, কিন্তু বুকের পাটা ত বলি একে। কিন্তু তাও বলি ধর্মদাসদা, আমাদের সাধ্যই বা কি! যাঁর কাজ তিনিই ওপরে থেকে করাচ্চেন। তারিণীদা শাপভ্রষ্ট দিকপাল ছিলেন বৈ ত নয়।

[ধর্মদাসের কিছুতেই কাশি থামে না, আর তাহারই সম্মুখে গোবিন্দ বেশ বেশ কথাগুলি এই অপরিপক্ক তরুণ জমিদারটিকে বলিয়া যাইতেছে দেখিয়া আরও ভাল বলিবার চেষ্টায় ধর্মদাস যেন আকুলি-বিকুলি করিতে লাগিল]

গোবিন্দ। তুমি ত আমার পর নও বাবা, নিতান্ত আপনার। তোমার মা ছিলেন আমার সাক্ষাৎ পিসতুত বোনের আপনার ভাগ্নী। রাধানগরের বাঁড়ুয্যে বাড়ি,—সে-সব তারিণীদা জানতেন। তাই যে-কোন কাজকর্মে—মামলা-মকর্দমা করতে, সাক্ষী দিতে—ডাক্ গোবিন্দকে—

ধর্মদাস। কেন বাজে বকিস গোবিন্দ? খক্ খক্ খক্—খ—আমি আজকের নই, না জানি কি? সে বছর সাক্ষী দেবার কথায় বললি আমার জুতো নেই, খালিপায়ে যাই কি করে? খক্ খক্—তারিণী অমনি আড়াই টাকা দিয়ে জুতো কিনে দিলে। তুই তাই পায়ে দিয়ে সাক্ষী দিয়ে এলি কিনা বেণীর হয়ে! খক্ খক্ খক—খ—

গোবিন্দ। (চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া) এলুম?

ধর্মদাস। এলিনে?

গোবিন্দ। দূর মিথ্যেবাদী!

ধর্মদাস। মিথ্যেবাদী তোর বাবা।

গোবিন্দ। (ভাঙ্গা ছাতি লইয়া লাফাইয়া উঠিল) তবে রে শালা!

ধর্মদাস। (বাঁশের লাঠি উঁচাইয়া) ও শালার আমি—খক খক খক—খ—ও শালার আমি সম্পর্কে বড়ভাই হই কিনা, তাই শালার আক্কেল দেখ! (কাশি)

গোবিন্দ। ওঃ—শালা আমার বড়ভাই!

[চারিদিকের লোক ছুটিয়া আসিল, ছেলে-মেয়েরা হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল এবং রমেশ দ্রুতপদে তাহাদের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইল]

রমেশ। এ কি এ! আপনারা উভয়েই প্রাচীন–ব্রাহ্মণ–এ কি কাণ্ড!

ভৈরব। (উঠিয়া আসিয়া রমেশের প্রতি) প্রায় শ'চারেক কাপড় ত হল, আরও চাই কি?

[রমেশ নিরুত্তর]

ভৈরব। ছিঃ গাঙ্গুলীমশাই, বাবু একেবারে অবাক হয়ে গেছেন। আপনি কিছু মনে করবেন না বাবু, এমন ঢের হয়। বৃহৎ কাজকর্মের বাড়িতে কত ঠ্যাঙাঠেঙি রক্তারক্তি পর্যন্ত হয়ে যায়–আবার যে কে সেই হয়। নিন চাটুয্যেমশাই, দেখুন দিকি আরও থান ফাড়বো কি না?

গোবিন্দ। হয়ই ত! হয়ই ত! ঢের হয়। নইলে বিরদ্ কর্ম বলেচে কেন। সে বছর তোমার মনে আছে ভৈরব, যদু মুখুয্যেমশাইয়ের কন্যা রমার গাছ-পিতিষ্ঠের দিন সিধে নিয়ে, রাঘব ভট্চায্যে আর হারান চাটুয্যেতে মাথা ফাটাফাটি হয়ে গেল! কিন্তু আমি বলি ভৈরব ভায়া, বাবাজীর এ কাজটা ভাল হচ্চে না। ছোটলোকদের কাপড় দেওয়া আর ভস্মে ঘি ঢালা এক কথা। তার চেয়ে বামুনদের একজোড়া আর ছেলেদের একখানা করে দিলে নাম হোতো। আমি বলি বাবাজী সেই যুক্তিই করুন, কি বল ধর্মদাসদা?

ধর্মদাস। গোবিন্দ মন্দ যুক্তি বলেনি বাবাজী। ওদের মিছে দেওয়া। নইলে আর শাস্তরে ব্যাটাদের ছোটলোক বলেচে কেন! বুঝলে না বাবা রমেশ?

রমেশ। হাঁ, বুঝেচি বৈ কি।

ভৈরব। তা হলে কি এই কাপড়েই হবে?

রমেশ। বোধ হয় হবে না। বলা যায় না কত কাঙ্গালী আসবে, আপনি বরঞ্চ আরও দু'শ কাপড় ঠিক করে রাখুন।

গোবিন্দ। তা নইলে কি হয়? তুমি একা আর কত পারবে ভায়া, চল আমিও যাই।

[বলিতে বলিতে গোবিন্দ বস্ত্ররাশির কাছে অগ্রসর হইয়া গেল, এবং উপবেশন করিয়া কাপড় গুছাইতে লাগিল। ধর্মদাস এই অবকাশে রমেশকে একধারে টানিয়া লইয়া গিয়া কানে কানে বলিতে লাগিল। ওদিকে গোবিন্দ উদ্‌গ্রীব হইয়া আড়চোখে চাহিয়া দেখিতে লাগিল]

ধর্মদাস। এ-দেশ বড় খারাপ বাবা, ভাঁড়ার-টাঁড়ার কাউকে দিয়ে বিশ্বেস কোরো না। তেল, নুন, ঘি, ময়দা অর্ধেক সরিয়ে ফেলবে। আমি এখুনি গিয়ে তোমার পিসীমাকে পাঠিয়ে দিচ্চি বাবা, একটি কুটো তোমার নষ্ট হবে না।

রমেশ। যে-আজ্ঞে—

[মুণ্ডিত-শ্মশ্রু শীর্ণকায় ও প্রাচীন দীননাথ ভট্টাচার্য প্রবেশ করিলেন। ইঁহার সঙ্গেও দুই-তিনটি ছেলে-মেয়ে। মেয়েটি সকলের বড়, পরনে একখানি শতচ্ছিন্ন ডুরে কাপড়]

দীননাথ। কৈ গো বাবাজী, কোথায় গো?

গোবিন্দ। (উঠিয়া দাঁড়াইয়া) এস দীনুদা, বোস। বড় ভাগ্যি আমাদের যে আজ তোমার পায়ের ধুলো পড়লো। ছেলেটা একা সারা হয়ে যায় তা তোমরা ত—

[ধর্মদাস কটমট করিয়া তাহার প্রতি চাহিল]

গোবিন্দ। তা তোমরা ত কেউ এদিক মাড়াবে না দাদা।

দীনু। আমি ত ছিলাম না ভায়া, তোমার বৌঠাকরুনকে আনতে তাঁর বাপের বাড়ি গিয়েছিলাম। বাবাজী কোথায়? শুনচি নাকি ভারী আয়োজন হচ্চে। পথে ও-গাঁয়ের হাটে শুনে এলাম খাইয়ে-দাইয়ে ছেলে-বুড়োর হাতে নাকি ষোল পাত লুচি আর চার জোড়া করে সন্দেশ দেওয়া হবে।

গোবিন্দ। (গলা খাটো করিয়া) তা ছাড়া হয়ত একখানা করে কাপড়ও—

[রমেশের প্রবেশ]

দীনুদা, এই আমার রমেশ। তা তোমাদের পাঁচজনের বাপ-মায়ের আশীর্বাদে যোগাড়-সোগাড় ত একরকম করচি, কিন্তু বেণী একেবারে উঠে পড়ে লেগেচে। এই আমার কাছেই দু'বার লোক পাঠিয়েচে। তা আমার কথা না হয় ছেড়েই দিলে, রমেশের সঙ্গে আমার নাড়ীর টান রয়েচে, কিন্তু এই যে দীনুদা, ধর্মদাসদা, এঁরাই কি বাবা তোমাকে ফেলতে পারবেন? দীনুদা ত পথ থেকে শুনতে পেয়ে ছুটে আসচেন। ওরে ও ষষ্ঠীচরণ, তামাক দে না রে! বাবা রমেশ, একবার এদিকে এসো দিকি, একটা কথা বলে নিই।

[ভৃত্য আসিয়া দীনুর হাতে হুঁকা দিয়া গেল এবং গোবিন্দ
রমেশকে আর একদিকে সরাইয়া লইয়া গিয়া চাপা গলায়]

গোবিন্দ। ভেতরে বুঝি ধর্মদাস-গিন্নি আসচে? খবরদার বাবা, খবরদার—বিট্‌লে বামুন যতই ফোসলাক, কখনো তার হাতে ভাঁড়ার-টাড়ার দিও না, মাগী অর্ধেক ফাঁক করে দেবে। বলি, তোমার ভাবনা কি বাবা? তোমার যে আপনার মামী রয়েচে। আমি গিয়েই তাকে পাঠিয়ে দিচ্চি, নাড়ীর টানে সে যেমন করবে আর কি কেউ তেমন পারবে? না, কখনো পারে?

[শিশু-দু'টা ছুটিয়া আসিয়া দীনুর কাঁধের উপর ঝুলিয়া পড়িল]

শিশুরা। বাবা, সন্দেশ খাবো।

দীনু। (একবার রমেশ ও একবার গোবিন্দর প্রতি চাহিয়া) সন্দেশ কোথায় পাব রে? সন্দেশ কৈ?

[দীনুর মেয়ে অন্তরালে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া]

দীনুর মেয়ে। কেন, ঐ যে হচ্চে বাবা—

[বাকি ছেলে-মেয়েরা নাকে কাঁদিতে কাঁদিতে
আসিয়া ধর্মদাসকে ঘিরিয়া ধরিল]

ছেলে-মেয়েরা। আঁমরাও দাঁদামশাই—

রমেশ। (অগ্রসর হইয়া) বেশ ত, বেশ ত, ও আচার্যিমশাই, বিকেলবেলায় ছেলেরা সব বাড়ি থেকে বেরিয়েচে, খেয়ে ত আসেনি। (অন্তরালবর্তী ময়রার উদ্দেশে) ওহে ও, কি নাম তোমার? নিয়ে এস ত ঐ থালাটা এদিকে। আচার্যিমশাই, দেখুন ত যেন দেরি না হয়।

[ভৈরব আচার্য ভিতরে চলিয়া গেল এবং ক্ষণকাল পরেই ময়রা সন্দেশের থালা আনিতেই ছেলেরা উপুড় হইয়া পড়িল—বাঁটিয়া দিবার অবকাশ দেয় না এমনি ব্যস্ত করিয়া তুলিল। ছেলেদের খাওয়া দেখিতে দেখিতে দীননাথের শুষ্কদৃষ্টি সজল ও তীব্র হইয়া উঠিল]

দীনু। ওরে ও খেঁদি, খাচ্ছিস ত খুব, সন্দেশ হয়েছে কেমন বল দিকি?

খেঁদি। বেশ বাবা—

[এই বলিয়া সে চিবাইতে লাগিল]

দীনু। (মৃদু হাসিয়া ঘাড় নাড়িয়া) হাঁ:—তোদের আবার পছন্দ! মিষ্টি হলেই হল। হাঁ হে কারিকর, এ কড়াটা কেমন নাবালে? কি বল গোবিন্দভায়া, এখনো রোদ একটু আছে বলে মনে হচ্চে না?

ময়রা। আজ্ঞে, আছে বৈ কি। এখনো ঢের বেলা আছে, এখনো সন্ধ্যে-আহ্নিকের—

দীনু। তবে কৈ দাও দিকি গোবিন্দভায়াকে একটা, চেকে দেখুক কেমন কলকাতার কারিকর তোমরা—

[ময়রা গোবিন্দ ও দীনু উভয়কেই সন্দেশ দিতে গেল]

দীনু। না না, আমাকে আবার কেন? তবে, আধখানা—আধখানার বেশী নয়। (হুঁকা রাখিয়া দিয়া) ওরে, ও ষষ্ঠীচরণ, একটু জল আন দিকি বাবা, হাতটা ধুয়ে ফেলি।

রমেশ। (ভিতরের দিকে চাহিয়া) ওরে, অমনি ভিতর থেকে গোটা-চারেক রেকাবী নিয়ে আসিস ষষ্ঠী।

গোবিন্দ। সন্দেশের চেহারা দেখেই বোধ হচ্চে হয়েছে ভাল। কি হে, ময়রার পো, পাকটা একটু নরমই রাখলে বুঝি?

ময়রা। আজ্ঞে হাঁ, এ কড়াটা একটু নরমই রেখেচি।

গোবিন্দ। (হাস্য করিয়া) আমরা বুঝি কিনা! তাকালেই ধরে দিতে পারি কোন্‌টা কেমন।

ময়রা। আজ্ঞে, আপনারা বুঝবেন না ত বুঝবে কারা!

[ষষ্ঠীচরণ ও আর একজন ভৃত্য রেকাবী, জলের গ্লাস প্রভৃতি আনিয়া উপস্থিত করিল, ময়রা সন্দেশের থালাটা সম্মুখে আনিয়া রাখিল, এবং ব্রাহ্মণদিগের পাত্রে তুলিয়া দিতে লাগিল। কাহারও মুখে কথা নাই, ছেলে-মেয়েরা এবং ধর্মদাস, গোবিন্দ ও দীনু গোগ্রাসে গিলিতেছে এবং দেখিতে দেখিতে সমস্ত থালাটাই নিঃশেষিত হইয়া গেল]

দীনু। হাঁ, কলকাতার কারিকর বটে! কি বল ধর্মদাসদা?

[ধর্মদাসের কণ্ঠস্বর সন্দেশের তাল ভেদ করিয়া বেশ স্পষ্ট
বাহির হইল না, কিন্তু বুঝা গেল মতের অনৈক্য নাই]

গোবিন্দ। (নিশ্বাস ফেলিয়া) হাঁ, ওস্তাদি হাত বটে!

ময়রা। যদি কষ্টই করলেন ঠাকুরমশাই, তা হলে মিহিদানাটাও অমনি পরখ করে দিন।

দীনু। মিহিদানা। কৈ আনো দিকি বাপু।

ময়রা। এই যে আনি।

[এই বলিয়া সে চক্ষের পলকে একথালা মিহিদানা আনিয়া হাজির করিল এবং ব্রাহ্মণদিগের পাত্রে উজাড় করিয়া দিল। মিহিদানা শেষ হইয়া আসিতে বিলম্ব হইল না]

দীনু। (হাত বাড়াইয়া মেয়ের প্রতি) ওরে ও খেঁদি, ধর দিকি মা, এই দুটো মিহিদানা।

খেঁদি। আমি আর খেতে পারবো না বাবা।

দীনু। পারবি পারবি। এক ঢোঁক জল খেয়ে গলাটা ভিজিয়ে নে দিকি, মুখ মেরে গেছে বৈ ত না। না পারিস আঁচলে একটা গেরো দিয়ে রাখ, কাল সকালে উঠে খাস।

[এই বলিয়া মেয়ের হাতে গুজিয়া দিল]

দীনু। (ময়রার প্রতি) হাঁ বাপু, খাওয়ালে বটে। যেন অমৃত। তা বেশ হয়েছে, মিষ্টি বুঝি দু' রকম করলে বাবাজী?

ময়রা। আজ্ঞে না, রসগোল্লা, ক্ষীরমোহন–

দীনু। অ্যাঁ, ক্ষীরমোহন? কৈ, সে ত বার করলে না বাপু? (বিস্মিত রমেশের মুখের প্রতি চাহিয়া) হাঁ খেয়েছিলাম বটে রাধানগরের বোসেদের বাড়ি, আজও যেন মুখে লেগে রয়েচে। বললে বিশ্বাস করবে না বাবাজী, ক্ষীরমোহন খেতে আমি বড্ড ভালবাসি।

রমেশ। (হাসিয়া) আজ্ঞে না, অবিশ্বাস করবার কোন কারণ নেই। ওরে ষষ্ঠী, ভেতরে বোধ করি আচায্যিমশাই আছেন, যা ত কিছু ক্ষীরমোহন তাঁকে আনতে বলে আয় দিকি।

[ষষ্ঠীচরণের প্রস্থান]

গোবিন্দ। (উদ্বিগ্নকণ্ঠে) অ্যাঁ? মিষ্টি কি সব বাইরে পড়ে নাকি! না না, এ ত ভাল না।

ধর্মদাস। চাবি? চাবি? ভাঁড়ারের চাবি কার কাছে?

গোবিন্দ। বলি, ভৈরো আচায্যির হাতে নয় ত?

[ষষ্ঠীচরণের প্রবেশ]

ষষ্ঠী। এখন আর ভাঁড়ার-ঘর খোলা হবে না বাবু, ক্ষীরমোহন বার হবে না।

রমেশ। আঃ, বল গে যা আমি আনতে বলচি।

গোবিন্দ। দেখলে ধর্মদাসদা, আচায্যির আক্কেল। এ যে দেখি মায়ের চেয়ে মাসীর বেশী দরদ। সে জন্যেই আমি বলি–

ষষ্ঠী। আচায্যিমশায়ের দোষ কি? ও-বাড়ি থেকে গিন্নি-মা এসে ভাঁড়ার বন্ধ করে ফেলেচেন। এ তাঁরই হুকুম।

ধর্মদাস ও গোবিন্দ। কে? বেণীবাবুর মা? ও-বাড়ির বড়-গিন্নিঠাকরুন?

রমেশ। জ্যাঠাইমা এসেচেন নাকি?

ষষ্ঠী। হাঁ বাবু। তিনি এসেই ছোট-বড় দুটো ভাঁড়ারই তালা-বন্ধ করে ফেলেচেন। চাবি তাঁরই আঁচলে।

গোবিন্দ। দেখলে ধর্মদাসদা ব্যাপারখানা? বলি মতলবটা বুঝলে ত?

দীনু। এ মতলব বোঝা আর শক্ত কি ভায়া! তালা-বন্ধ করে চাবি নিজের কাছে রেখেচেন, তার মানে ভাঁড়ার আর কারো না হাতে পড়ে। তিনি সমস্তই ত জানেন।

গোবিন্দ। বোঝ না সোঝ না তুমি কথা কও কেন বল ত? তুমি এ-সব ব্যাপারের কি জানো যে হঠাৎ মানে করতে এসেচ?'

দীনু। আরে, এতে বোঝা-বুঝিটা আছে কোন্‌খানে? শুনচো না গিন্নী-মা স্বয়ং এসে তালা-বন্ধ করেছেন? এতে কথা কইবে আবার কে?

গোবিন্দ। ঘরে যাও না ভটচায। যে জন্যে ছুটে এলে, গুষ্টিবর্গ মিলে খেলে, বাঁধলে—আর কেন? ক্ষীরমোহন পরশু খেয়ো, আজ বাড়ি যাও, আমাদের ঢের কাজ।

রমেশ। আপনার হল কি গাঙ্গুলীমশাই? যাকে-তাকে এমন খামোকা অপমান করচেন কেন?

[ধমক খাইয়া গোবিন্দ লজ্জিত হইল। পরে শুষ্কহাস্য করিয়া]

গোবিন্দ। অপমান আবার কাকে করলাম বাবাজী। ভাল, ওকেই জিজ্ঞাসা করে দেখ না ঠিক সত্যি কথাটি বলেচি কিনা? ও ডালে-ডালে বেড়ায় যদি, আমি পাতায়-পাতায় ঘুরি যে। দেখলে ধর্মদাসদা, দীনে বামনার আস্পর্ধা? আচ্ছা রমেশ। আচ্ছা কি?

দীনু। (রমেশের প্রতি) না বাবা, গোবিন্দ সত্য কথাই বলেচেন। আমি বড় গরীব সে এদিকের সবাই জানে। ওঁদের মত আমার জমি-জমা চাষ-বাস কিছুই নেই, একরকম চেয়েচিন্তে ভিক্ষে-শিক্ষে করেই আমাদের দিন চলে।—ভাল জিনিস ছেলেপিলেদের কিনে খাওয়াবার ক্ষমতা ত ভগবান দেননি, তাই বড়ঘরে কাজকর্ম হলে ওরা খেয়ে বাঁচে। কিছু মনে কোরো না বাবা, তারিণীদাদা বেঁচে থাকতে আমাদের তিনি খাওয়াতে বড় ভালবাসতেন।

[দীনুর দু'চক্ষু জলে ভরিয়া টপটপ করিয়া দু'ফোঁটা অশ্রু সকলের সম্মুখেই ঝরিয়া পড়িল। দীনু মলিন ও ছিন্ন উত্তরীয়-প্রান্তে তাহা মুছিয়া ফেলিল]

গোবিন্দ। আহা! তারিণীদাদা শুধু তোমাকে খাওয়াতেই ভালবাসতেন। শুনলে ধর্মদাসদা, শুনলে কথা?

দীনু। আমি কি তাই বলচি গোবিন্দ? আমার মত গরীব-দুঃখী কেউ কখনো তারিণীদার কাছ থেকে খালি হাতে ফেরেনি।

রমেশ। ভটচায্যিমশাই, এই দুটো দিন আমার ওপরে একটু দয়া রাখবেন। আর যদি খাঁদুর মা এ-বাড়িতে একবার পায়ের ধুলো দিতে পারেন ত ভাগ্য বলে মানব।

দীনু। আমি বড় গরীব বাবা, আমি বড় দুঃখী। আমাকে এমন করে বললে যে আমি লজ্জায় মরে যাই–

[ভৃত্যের প্রবেশ]

ভৃত্য। বাবু, গিন্নি-মা একবার বাড়ির ভেতরে ডাকচেন।

রমেশ। যাই।

দীনু। বাবা, আমরা তা হলে এখন আসি।

রমেশ। আসুন, কিন্তু আমার প্রার্থনা যেন ভুলে যাবেন না।

দীনু। না বাবা, প্রার্থনা বলচ কেন, এ তোমার দয়া।

[ছেলেদের লইয়া দীনুর প্রস্থান]

গোবিন্দ। বাবা রমেশ, আমিও এখন তাহলে আসি। সন্ধ্যে-আহ্নিক, ঠাকুরের শীতল দেওয়া–রমেশ। কিন্তু গাঙ্গুলীমশাই–

গোবিন্দ। কিছু বলতে হবে না বাবা, এ আমার আপনার কাজ। তুমি না ডাকলেও আমাকে নিজে এসে সমস্ত করতে হতো। কাল সক্কালেই তোমার মামীকে পাঠিয়ে দিয়ে তবে নিশ্চিন্ত হতে পারব।

ধর্মদাস। তুই বড় বাজে বকিস গোবিন্দ।

গোবিন্দ। কোন ভাবনা নেই রমেশ, ভাঁড়ার-টাড়ার যা কিছু—

ধর্মদাস। ভাঁড়ারের জন্যে তোর এত মাথাব্যথা কেন বল ত?

গোবিন্দ। এ আমাদের নিজের কাজ বাবা। আমি আর ধর্মদাসদা—আমরা দু'ভাই তোমার ডাকার অপেক্ষা রাখিনি,—আপনারাই এসে উপস্থিত হয়েচি। হয়েচি কিনা?

ধর্মদাস। বলি শোন রমেশ, আমরা বেণী ঘোষাল নই, আমাদের জন্মের ঠিক আছে।

রমেশ। আঃ—কি বলচেন আপনারা?

[জ্যাঠাইমা অন্তরাল হইতে একটুখানি মুখ বাহির করিয়া]

জ্যাঠাইমা। ওরা অমনিই বলে রমেশ! শিক্ষা আর সঙ্গদোষে জানেও না যে, কি ওরা বললে।

[গোবিন্দ ও ধর্মদাসের দ্রুতপদে প্রস্থান

রমেশ। জ্যাঠাইমা!

জ্যাঠাইমা। হাঁরে আমিই। বলি চিনতে পারিস ত?

[বলিতে বলিতে তিনি সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার বয়স পঞ্চাশের কম নয়, কিন্তু কিছুতেই চল্লিশের বেশী বলিয়া মনে হয় না। মাথার চুলগুলি ছোট করিয়া ছাঁটা, দুই-এক গাছি কুঞ্চিত হইয়া কপোলের উপর পড়িয়াছে। একদিন যে রূপের খ্যাতি এ-অঞ্চলে প্রসিদ্ধ ছিল, আজিও সেই অনিন্দ্যসৌন্দর্য তাঁহার নিটোল পরিপূর্ণ দেহটিকে বর্জন

করিয়া দূরে যাইতে পারে নাই। দেখিয়া আজও মনে হয় তাঁহার সকল অবয়ব যেন শিল্পীর সাধনার ধন]

রমেশ। একদিন যে ছেলেকে তুমি মানুষ করেছিলে, আর একদিন বড় হয়ে ফিরে এসে সে-ই তোমাকে চিনতে পারবে না এই কি তোমার রমেশের কাছে আশা কর জ্যাঠাইমা?

জ্যাঠাইমা। না, সে আশঙ্কা করিনি রমেশ। তবুও ত তোরই মুখ থেকে না শুনে পারিনে বাবা, জ্যাঠাইমাকে তোর মনে আছে।

রমেশ। মনে আছে মা, খুব বড় করেই তোমাকে মনে আছে। কিন্তু যা পারতাম নিজেই করতাম, তুমি কেন আবার এ-বাড়িতে এলে?

জ্যাঠাইমা। তুই ত আমাকে ডেকে আনিস নি বাবা, যে তোর কাছে তার কৈফিয়ত দেব।

রমেশ। ডেকে আনব কি মা, মা বলে যে তোমার কোলেই সকলের আগে ছুটে গিয়েছিলাম। কিন্তু বাড়ি নেই বলে ত তুমি দেখা করনি জ্যাঠাইমা!

জ্যাঠাইমা। সেই অভিমানেই বুঝি নিজের বাড়ি থেকে আজ আমাকে বিদায় করতে চাস রমেশ?

রমেশ। অভিমান! যার মা নেই, বাপ নেই, নিজের জন্মভূমিতে যে নিরাশ্রয়, বিদেশী,—বিনাদোষে যাকে প্রতিবেশী আত্মীয়-স্বজন বাড়ি থেকে দূর করে দেয় তার অভিমানের দাম কি জ্যাঠাইমা?

জ্যাঠাইমা। আমার কাছেও তার দাম নেই রমেশ?

রমেশ। না নেই। আজ নিজের ছেলেকেই শুধু ছেলে বলে জেনে রেখেচ। কিন্তু আর একটা মা-মরা ছেলেকে যে একদিন ঠিক তেমনি কোরেই মানুষ করতে হয়েছিল সে কথা আজ ভুলে গেছ।

জ্যাঠাইমা। এমনি কোরে শূল বিঁধে তুই কথা বলবি রমেশ? ঘরে-বাইরে এই শাস্তি পাব বলেই কি তোদের দুজনকে মানুষ করেছিলাম রে?

রমেশ। ঘরে-বাইরে! তাই ত বটে! (হঠাৎ পায়ের কাছে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া) আমাকে ক্ষমা করো জ্যাঠাইমা, আমি প্রাণের জ্বালায় তোমার এই দিকটার পানে চেয়ে দেখিনি।

[জ্যাঠাইমা রমেশকে তুলিয়া ডান হাত
দিয়া তাহার চিবুক স্পর্শ করিলেন]

জ্যাঠাইমা। জানি বাবা।

রমেশ। কিন্তু আর তুমি এ-বাড়িতে এসো না। আমার সব সইবে, কিন্তু আমার জন্যে দুঃখ পাবে এ আমার সইবে না জ্যাঠাইমা।

জ্যাঠাইমা। এ তোর অন্যায় রমেশ। দুঃখ সওয়াই যদি দরকার হয় ত তোরও সইবে, আমারও সইবে। ফাঁকি দিয়ে আরামের চেষ্টা করলে, তার ফাঁক দিয়ে শুধু আরামই বার হয়ে যায় না বাবা, ঢের বেশি দুঃখ হুড়মুড় কোরে ঢুকে পড়ে। আমাকে বারণ করবার মতলব তুই করিস নে। তা ছাড়া তোর নিষেধ শুনবোই বা কেন?

রমেশ। তোমাকে ভুলেছিলাম জ্যাঠাইমা, তাই নিষেধ করবার স্পর্ধা করেচি। আমার কথা তুমি শুনো না—যা তোমার ভাল মনে হবে তাই করো।

জ্যাঠাইমা। তাইতো করবো।

রমেশ। কোরো। কত ঝড়-বাদল, কত দুর্যোগ তোমার মাথার ওপর দিয়ে বয়ে গেছে—দূর থেকে মাঝে মাঝে আমি তার খবর পেয়েচি। কিন্তু কিছুতেই তোমাকে বদলাতে পারেনি। তেমনি অনির্বাণ তেজের আগুন তোমার বুকের মধ্যে তেমনিই দপদপ করে জ্বলচে।

জ্যাঠাইমা। তুই থাম, ছেলে-মুখে বুড়ো-কথা বলিস নে।—তা শোন। তোর বড়দার কাছে একবার গিয়েছিলি?

[রমেশ অধোমুখে নীরব]

জ্যাঠাইমা। বাড়ি নেই বলে দেখা করেনি বুঝি?

[রমেশ তেমনি নিরুত্তর]

জ্যাঠাইমা। না-ই করুক, আর একবার যা। (ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া) আমি জানি রে, সে তোদের ওপর প্রসন্ন নয়, কিন্তু তোর কাজ ত তোকে করা চাই। সে বড় ভাই—তার কাছে হেঁট হতে তোর লজ্জা নেই। তা ছাড়া এটা মানুষের এমনি দুঃসময় বাবা, যে-কোন লোকের হাতে-পায়ে ধরে মিটমাট করে নেওয়াই মনুষ্যত্ব। লক্ষ্মী মানিক আমার—যা আর একবার। এখন হয়ত সে বাড়িতেই আছে।

রমেশ। তুমি আদেশ করলেই যাব জ্যাঠাইমা।

জ্যাঠাইমা। আর দ্যাখ, রমাদের ওখানেও একবার যা।

রমেশ। গিয়েছিলাম।

জ্যাঠাইমা। গিয়েছিলি? তোকে সে চিনতে পেরেছিল ত?

রমেশ। বোধ হয় পেরেছিল। নইলে অপমান করে বাড়ি থেকে দূর করে দেবে কেন?

জ্যাঠাইমা। অপমান করে দূর করে দিলে? রমা?

রমেশ। অপমানটা বোধ করি তার তেমন মনঃপূত হয়নি। তাই বলে দিয়েচে এবার এলে দরোয়ান দিয়ে বার করে দেবে।

জ্যাঠাইমা। রমা বলেচে? এ যে নিজের কানে শুনলেও বিশ্বাস হয় না রমেশ!

রমেশ। বড়দা ছিলেন, তাঁকে জিজ্ঞাসা করে দেখো জ্যাঠাইমা।

জ্যাঠাইমা। বেণী ছিল? তবে, হবেও বা। (একমুহূর্ত পরে) কিন্তু ঠিক বলচিস রমেশ, রমা বললে বাড়ি ঢুকলে দরোয়ান দিয়ে বার করে দেবে? আমাকে ভাঁড়াস নে বাবা, ঠিক করে বল।

রমেশ। হাঁ জ্যাঠাইমা, তাই। তবে, নিজে না বলে কে তার মাসী আছে তার মুখ দিয়েই বলিয়েচে।

জ্যাঠাইমা। (নিশ্বাস ফেলিয়া) ওঃ—তাই বল। নইলে রাতও মিথ্যে দিনও মিথ্যে রমেশ, এত বড় গর্হিত কথা তার গলায় ছুরি দিলেও সে তোকে বলতে পারত না। এ সেই মাসীর কথা, তার নয়।

রমেশ। তবে কি তাদের বাড়িতেও আমাকে যেতে হুকুম করো জ্যাঠাইমা? রমাকে কি তুমি এমনি করেই জান?

জ্যাঠাইমা। জানি। কিন্তু যেতে আর বলিনে। তোর বাপের সঙ্গে তাদের চিরদিন মামলা-মকদ্দমা চলেচে, তাদের শত্রু বললেও মিথ্যে বলা হয় না, তবুও আমি জানি ও কথা রমা বলেনি। অমন মেয়ে বাবা, লক্ষ কোটির মধ্যেও সহজে খুঁজে পাওয়া যায় না। ও আছে বলে তবুও এই গ্রামের মধ্যে একটুখানি ধর্ম বেঁচে আছে।

রমেশ। তাকে দেখে ত সে কথা মনেও হল না জ্যাঠাইমা।

জ্যাঠাইমা। হঠাৎ হয়ও না, তবুও এ কথা সত্যি রমেশ। তা সে যাই হোক, সেখানে যখন যাওয়াই হতে পারে না তখন তা নিয়ে চিন্তা করে লাভ নেই। কিন্তু এতক্ষণ যাঁরা এখানে ছিলেন এবং আমি আসামাত্রই যাঁরা সরে গেলেন তাঁদের তুই বিশ্বেস করিস নে বাবা, তাঁদের আমি চিনি।

রমেশ। কিন্তু তাঁরাই ত এ বিপদে আমার সবচেয়ে আপনার লোক জ্যাঠাইমা। তাঁদের বিশ্বাস না করলে কাদের করবো?

জ্যাঠাইমা। তাই ত ভাবচি বাবা, এ কথার জবাব দেবই বা কি! হাঁ রে, তোর নেমন্তন্নর ফর্দ তৈরি হয়ে গেছে?

রমেশ। না, এখনো হয়নি।

জ্যাঠাইমা। সেইটে একটু বুঝে-সুঝে করিস রমেশ। এ গ্রামে, আর এই গ্রামেই বা বলি কেন, সব গাঁয়েই এই। এ ওর সঙ্গে খায় না, ও তার সঙ্গে কথা কয় না,—একটা কাজকর্ম পড়ে গেলে মানুষের আর দুশ্চিন্তার অন্ত থাকে না। কাকে বাদ দিয়ে কাকে রাখা যায়, এর চেয়ে শক্ত কাজ আর নেই।

রমেশ। কেন এ-রকম হয় জ্যাঠাইমা?

জ্যাঠাইমা। সে অনেক কথা বাবা। যদি থাকিস এখানে, আপনিই সব জানতে পারবি। কারুর সত্যিকার দোষ-অপরাধ আছে, কারুর মিথ্যে অপবাদ আছে, তা ছাড়া মামলা-মকদ্দমা, মিথ্যে সাক্ষী দেওয়া নিয়েও মস্ত দলাদলি। আমি যদি তোর এখানে দু'দিন আগে আসতাম রমেশ, এত উদ্যোগ-আয়োজন কিছুতে করতে দিতাম না। কি যে সেদিন হবে আমি তাই শুধু ভাবচি।

[এই বলিয়া তিনি নিশ্বাস মোচন করিলেন]

রমেশ। তোমার দীর্ঘনিশ্বাসের মর্ম বোঝা কঠিন জ্যাঠাইমা, কিন্তু আমার সঙ্গে ত এর কোন যোগ নেই। আমাকে বিদেশী বললেই হয়,—কারো সঙ্গে শত্রুতাও নেই, দলাদলিও নেই,—আমি কাউকে অপমান করতে পারব না, সকলকেই সসম্ভ্রমে আহ্বান করে আনব।

জ্যাঠাইমা। উচিত ত তাই। কিন্তু—যাই হোক, সকলের মত নিয়ে এ কাজটা করিস বাবা, নইলে ভারী গণ্ডগোল হবে। মা বিপদ-তারিণী।

রমেশ। তুমি কি এখুনি চলে যাচ্ছ?

জ্যাঠাইমা। না এখখুনি নয়! দু'একটা কাজ পড়ে আছে সেগুলো সেরে ফেলেই যাবো। কিন্তু চাবি আমার সঙ্গে রইলো রমেশ, কাল সক্কালেই আমি নিজে এসে ভাঁড়ার খুলব।

[প্রস্থান

[ধর্মদাস, গোবিন্দ ও পরাণ হালদারের প্রবেশ]

গোবিন্দ। (রমেশের প্রতি) বাবা, এই পরাণ-মামাকে ধরে নিয়ে এলাম। আসতে কি চায়! কিন্তু আমিও ছাড়নে-বালা নই! বলি, বেণীই জমিদার আর আমার ভাগ্‌নে রমেশ

নয়? (উপরের দিকে মুখ তুলিয়া) তারিণীদা, স্বর্গে বসে সমস্তই দেখচো শুনচো, কিন্তু এই তোমার কাছে প্রতিজ্ঞে করচি আমি, এই উঠোনের ওপর বেণীর যদি না এমনি করে নাক রগড়াতে পারি ত আমার নামই গোবিন্দ গাঙ্গুলী নয়।

ধর্মদাস। আহা, তুই থাম না গোবিন্দ। (কাশিতে কাশিতে) সে আমি ঠিক করে নেব।

[অকস্মাৎ বেণী ঘোষাল প্রবেশ করিল]

বেণী। এই যে রমেশ, একবার এলাম—বড় জরুরী কাজ—মা এসেচেন নাকি?

গোবিন্দ। আসবে বৈ কি বাবা, একশ'বার আসবে। এ ত তোমারই বাড়ি। তাই ত আমি রমেশ বাবাজীকে সকাল থেকে বলচি, রমেশ, ঝগড়া-বিবাদ তারিণীদার সঙ্গেই যাক—আর কেন? তোমরা দু'ভাই এক হও, আমরা দেখে চোখ জুড়োই! তা ছাড়া বড় গিন্নীঠাকরুন যখন স্বয়ং এসে উপস্থিত হয়েচেন, তখন—

বেণী। মা এসেচেন?

গোবিন্দ। শুধু আসা কেন, ভাঁড়ার-টাঁড়ার, করা-কর্ম যা-কিছু তিনিই ত করচেন। আর তিনি না করলে করবেই বা কে?

[সকলেই নীরব হইয়া রহিল]

গোবিন্দ। (নিশ্বাস ফেলিয়া) নাঃ—গাঁয়ের মধ্যে বড়-গিন্নীঠাক্‌রুনের মত মানুষ কি আর আছে? না, হবে? না বেণীবাবু, সামনে বললে খোশামোদ করা হবে, কিন্তু যে যাই বলুক, গাঁয়ে যদি লক্ষ্মী থাকেন ত সে তোমার মা। এমন মা কারু হয়?

[এই বলিয়া পুনশ্চ একটা নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন]

বেণী। আচ্ছা—

গোবিন্দ। শুধু আচ্ছা নয় বেণীবাবু। আসতে হবে, করতে হবে, সমস্ত ভার তোমার ওপর। ভাল কথা, সবাই আপনারা ত উপস্থিত আছেন, নেমন্তন্নটা কিরকম হবে একটা ফর্দ করে ফেলা হোক। কি বল রমেশ বাবাজী? ঠিক কি না হালদার মামা? ধর্মদাসদা চুপ করে থাকলে হবে না,—কাকে বলতে হবে, কাকে বাদ দিতে হবে জান ত সব।

রমেশ। বড়দা, একবার পায়ের ধুলো যদি দিতে পারেন—

বেণী। মা যখন এসেচেন তখন আমার আসা না-আসা—কি বলো গোবিন্দ খুড়ো?

রমেশ। আপনাকে আমি পীড়াপীড়ি করতে চাইনে বড়দা, যদি অসুবিধে না হয় ত একবার দেখে-শুনে যাবেন।

বেণী। সে ত ঠিক। আমার মা যখন এসেচেন তখন আমার আসা না-আসা—কি বল হালদার-মামা? তা মাকে একটু শিগগির যেতে বোলো রমেশ, বিশেষ দরকারী কাজ, আমারও এখন দাঁড়াবার জো নেই—প্রজারা সব—

[বলিতে বলিতে বেণীর দ্রুতপদে প্রস্থান

গোবিন্দ। (নেপথ্যে গলা বাড়াইয়া দেখিয়া লইয়া) আরে, বেণী ঘোষাল! তুই পাতায়-পাতায় বেড়াস ত আমি তার শিরে-শিরে ফিরি। আমার নাম গোবিন্দ গাঙ্গুলী। নিজের চোখে দেখতে এসেচে মা এসেচে কিনা! বুঝি না বটে! (রমেশের প্রতি) আর দেখলে বাবা রমেশ, কেমন তোফা মিষ্টি মোলায়েম কথাগুলি শুনিয়ে দিলাম! যেন মিছরির ছুরি! আর বলবার জো নেই যে কর্মবাড়িতে গিয়ে খাতির পাইনি। লোকের কাছে যে বলে বেড়াবে, রমেশ না হয় ছেলেমানুষ, কিন্তু তার মামা গোবিন্দ গাঙ্গুলী ত উপস্থিত ছিল।

বৃহৎ কাজেকর্মে কর্মকর্তা হয়ে থাকা সহজ ব্যাপার নয় বাবা, এক-একটা চাল ভাবতে মাথা ঘুরে যায়!

ধর্মদাস। তুই বড় বাজে বকিস গোবিন্দ! থাম না!

[একদিক দিয়া সুকুমারী ও তাহার মা ক্ষান্ত প্রবেশ করিয়া বাটীর অন্তঃপুরে চলিয়া গেল। পরাণ হালদার কঠিন-চক্ষে তাহাদের নিরীক্ষণ করিলেন। মুহূর্তে ভৃত্য ষষ্ঠীচরণ প্রবেশ করিল]

পরাণ। ওরা বাড়ির মধ্যে গেল কারা?

ষষ্ঠী। ক্ষান্ত বামুন-ঠাকরুন আর তাঁর মেয়ে।

পরাণ। যা ভেবেচি তাই। ওদের বাড়ি ঢুকতে দিলে কে?

ষষ্ঠী। আচায্যিমশাই ডেকে এনেচেন। দু'দিন ধরে সমস্ত কাজকর্ম করচেন।

পরাণ। ওরা যদি খাদ্যদ্রব্য স্পর্শ করে থাকে ত কোন ব্রাহ্মণই এখানে জলগ্রহণ করতে পারবে না।

[ক্ষান্ত আড়ালে দাঁড়াইয়া বোধ হয় শুনিতেছিল,
তৎক্ষণাৎ বাহির হইয়া আসিল]

ক্ষান্ত। কেন শুনি হালদার-ঠাকুরপো? (রমেশের প্রতি) হাঁ বাবা, তুমিও ত গাঁয়ের একজন জমিদার, বলি সমস্ত দোষই কি এই ক্ষেন্তি বামনীর মেয়ের? মাথার উপর আমাদের কেউ নেই বলে কি যতবার ইচ্ছে শাস্তি দেবে? (গোবিন্দকে দেখাইয়া) ঐ উনি মুখুয্যেবাড়ির গাছ-পিতষ্ঠের সময় জরিমানা বলে দশ টাকা আদায় করেন নি? গাঁয়ের

ষোল-আনা মনসা-পূজোর নামে দু'জোড়া পাঁঠার দাম ধরে নেননি? তবে কতবার ঐ এককথা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে চায় শুনি?

গোবিন্দ। যদি আমার নামটাই করলে ক্ষান্তমাসী, তবে সত্যি কথা বলি বাছা, খাতিরে কথা কইবার লোক গোবিন্দ গাঙ্গুলী নয়, সে দেশসুদ্ধ লোকে জানে। তোমার মেয়ের প্রায়শ্চিত্তও হয়েচে, সামাজিক দণ্ডও করেচি,—সব মানি। কিন্তু যজ্ঞিতে কাঠি দিতে ত আমরা হুকুম দিইনি? মরলে ওকে পোড়াতে আমরা কাঁধ দেব, কিন্তু—

ক্ষান্ত। মলে তোমার নিজের মেয়েকে কাঁধে করে পোড়াতে যেয়ো বাছা, আমার মেয়ের ভাবনা তোমাকে ভাবতে হবে না। বলি, হাঁ গোবিন্দ, নিজের গায়ে হাত দিয়ে কি কথা কও না? তোমার ছোট-ভাজের কাশীবাসের কথা মনে পড়ে না! হালদার-ঠাকুরপোর বেয়ানের তাঁতী অপবাদ ছিল না? সে-সব বড়লোকের বড় কথা বুঝি?

গোবিন্দ। তবে রে হারামজাদা মাগী—

ক্ষান্ত। (অগ্রসর হইয়া) মারবি নাকি রে? ক্ষেন্তি বামনীকে ঘাঁটালে ঠগ বাছতে গাঁ উজোড় হয়ে যাবে। বলি, এতেই হবে, না আরও বলবো?

[ভৈরব আচার্য দ্রুতপদে প্রবেশ করিয়া]

ভৈরব। এতেই হবে মাসী, আর কাজ নেই। (ভিতরের দিকে চাহিয়া) সুকুমারী, চল দিদি, এসো মাসী আমার সঙ্গে বাড়ির ভেতরে গিয়ে বসবে চল।

[ভৈরব ও ক্ষান্তর প্রস্থান]

গোবিন্দ। দেখলে পরাণ-মামা, আমাদের অপমান করে ওদের বাড়ির ভেতরে বসাতে নিয়ে চলল। দেখলে ভৈরবের আস্পর্ধা! আচ্ছা—

পরাণ। আমাদের বিনা হুকুমে ঐ দুটো ভ্রষ্টা মাগীদের কেন বাড়িতে ঢুকতে দেওয়া হল, রমেশ তার কৈফিয়ত দিক। নইলে কেউ আমরা এখানে জলস্পর্শ করব না।

জ্যাঠাইমা। (দ্বারের নিকট হইতে) রমেশ!

রমেশ। তুমি কি এখনো আছ জ্যাঠাইমা?

জ্যাঠাইমা। আছি বৈ কি। গোবিন্দ গাঙ্গুলীকে বল যে ক্ষান্ত-ঠাকুরঝি আর সুকুমারীকে আদর করে আমি ডেকে আনিয়েচি, আচায্যিমশাই নয়। তাঁদের খামোকা অপমান করার কোন দরকার ছিল না।

পরাণ। কিন্তু ওদের দূর করে না দিলে আমরা কেউ জলগ্রহণ করতে পারব না।

জ্যাঠাইমা। সে পরশুর কথা। আজ আমার কর্ম-বাড়িতে চেঁচামেঁচি হাঁকাহাঁকি করতে আমি নিষেধ করচি। আমি সকলকেই নিমন্ত্রণ করব, কাউকে বাদ দিতে পারব না।

পরাণ। কিন্তু আমরা কেউ এখানে জলটুকু পর্যন্ত মুখে দিতে পারব না।

জ্যাঠাইমা। আমাকে ভয় দেখাতে বারণ কর রমেশ। দেশে অনাথ-আতুর কাঙালের অভাব নেই। আয়োজন আমার ব্যর্থ হবে না।

রমেশ। (ব্যাকুলকণ্ঠে) কিন্তু সমস্ত এঁরা পণ্ড কোরে দিতে চান। এর সকল দায় যে তোমার মাথায় পড়বে জ্যাঠাইমা!

জ্যাঠাইমা। এ তোর অন্যায় রমেশ। আমার বাড়ির কাজের দায়িত্ব আমার মাথায় পড়বে না ত কি পরের মাথায় পড়বে? এখন ওঁদের যেতে বলে দে। ঢের কাজ পড়ে আছে, নষ্ট করবার সময় নেই।

[জ্যাঠাইমা অন্তঃপুরে চলিয়া গেলেন। সদর দ্বার দিয়া গোবিন্দ, ধর্মদাস ও পরাণ হালদার ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল]

রমেশ। ভেবেছিলাম বুঝি আমার কেউ নেই,—কিন্তু সবাই আছে যার তুমি আছ জ্যাঠাইমা।

তৃতীয় দৃশ্য

গ্রাম্য পথ

[দীনু ভটচায শ্রাদ্ধবাটী হইতে নিমন্ত্রণ খাইয়া ঘরে ফিরিতেছে। সঙ্গে পটল, ন্যাড়া, বুড়ী প্রভৃতি বালক-বালিকা। সকলেরই হাতে ছোট-বড় পুঁটলি, অন্য হাতে খুরিতে করিয়া দধি, ক্ষীর প্রভৃতি]

খেঁদি। (সভয়ে) বাবা, ভোজো আসচে–

[শুনিয়া সকলে চকিত হইয়া উঠিল।
রমেশের ভৃত্য ভজুয়া প্রবেশ করিল]

দীনু। এই যে ভজুয়াবাবু, কোথায় যাওয়া হচ্ছে?

ভজুয়া। আরে ই-সব কি লিয়ে যাচ্চে ভটচায-মোশা–

দীনু। কিছুই নয় বাবা,–এই দুটো এঁটো-কাঁটা–পাড়ার ছোটলোক গরীব-দুঃখীর ছেলেমেয়ে আছে ত, গেলেই সব হাত পেতে দাঁড়াবে, তাদেরই দেবার জন্যে–

ভজুয়া। আরে, কমতি কি আছে। পুরি মিঠাই কেত্না গরীব-দুঃখী উহই বএঠকে খা রহা–

দীনু। খাচ্চে বৈ কি বাবা, খাচ্চে বৈ কি। রাজার ভাণ্ডার, অভাব কি! তবে সবাই কি আসতে পারবে? তাদের জন্যেই দুটো-একটা–

ভজুয়া। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক ঠিক। বড়ি খারাব গাঁও ভটচায, কিত্না গুলমাল। ই উঠে তো উ বোসে, ই ভাগে তো উ খিঁচকে লাগে—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—

দীনু। হয় বাবা হয়, বিরদ কাজে-কর্মে—বুড়ী, পটলার হাতটা একবার বদলে নে মা আমাদের গাঁ ত তবু পদে আছে বাবা—হোরে, পথপানে চেয়ে চল না। হোঁচট খেয়ে দইয়ের ভাঁড়টা ফেলে দিবি যে। যে কাণ্ড দেখে এলাম খেঁদির মামার বাড়িতে,—বিশ-ঘর বামুন-কায়েতের বাস নেই বাবা—দশটা দলাদলি। পটলা, হাঁ করে স্বগ্‌গ-পানে তাকিয়ে যাচ্ছিস যে? তবে একটা কথা বলতে পারি বাবা, ভিক্ষে-শিক্ষে করতে অনেক জায়গাতেই ত যাই, অনেকে অনুগ্রহও করেন, আমি দেখেচি তোমার বাবুর মত ছেলে-ছোকরাদেরই যা কিছু দয়ামায়া আছে। নেই কেবল বুড়ো ব্যাটাদের। বাগে পেলেই একজন আর একজনের গলায় পা দিয়ে জিভ বার করে তবে ছাড়ে।

[এই বলিয়া নিজের জিভ বাহির করিয়া দেখাইল]

ভজুয়া। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ।

১১২৯

দীনু। তা ভজুয়াবাবু কোথায় যাচ্চ?

ভজুয়া। আচায্যিঠাকুরকে বাড়ি।

দীনু। তা যাও যাও, একটু তরস্ত যাও। আমরাও আসি বাবা।

[সকলের প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

[মধু পালের মুদির দোকান। কেনা-বেচা চলিতেছে]

১ম খরিদ্দার। এক পয়সার তেল দিতে কি বেলা কাটিয়ে দেবে নাকি?

মধু। এই যে দিই।

২য় খরিদ্দার। এক পয়সার হলুদ দিতে কি বুড়ো হয়ে যাবে পালদা?

মধু। এই যে রে ভাই দিচ্ছি। একলা মানুষ—

৩য় খরিদ্দার। দু'পয়সার মুশুর ডালের জন্যে দেখচি এবেলা আর রান্না চড়ানো হবে না!

মধু। হবে গো খুড়ো হবে, এই নাও না।

[রমেশের প্রবেশ]

মধু। (গলা বাড়াইয়া দেখিয়া) অ্যাঁ! এ যে আমাদের ছোটবাবু! প্রাতঃপেন্নাম হই। (এই বলিয়া সে একটা মোড়া-হাতে বাহির হইয়া আসিল) আমার সাত-পুরুষের ভাগ্যি যে দোকানে আপনার পায়ের ধুলো পড়লো। বসুন।

রমেশ। শ্রাদ্ধর দরুন দশটা টাকা বাকী পড়ে আছে, তুমিও যাও না, আমারও পাঠানো হয় না। আজ ভাবলেম নিজেই গিয়ে দিয়ে আসি। এই নাও।

মধু। (হাত পাতিয়া গ্রহণ করিয়া) এ ত আমাদের বাপ-দাদারাও কখনো শোনেনি, বাবু, মানুষের বাড়ি বয়ে এসে টাকা দিয়ে যায়!

রমেশ। (মোড়ায় উপবেশন করিয়া) দোকান কেমন চলচে মধু?

মধু। কেমন করে আর ভাল চলবে বাবু? দু-আনা চার-আনা এক-টাকা পাঁচ-সিকে করে প্রায় ষাট- সত্তর টাকা বিলেত পড়ে গেছে। এই ও- বেলায় দিয়ে যাচ্চি বলে আর ছ'মাসেও আদায় হবার জো নেই—এ কি, বাঁড়ুয্যেমশাই যে! কবে এলেন? প্রাতঃপেন্নাম হই।

[বাঁড়ুয্যেমশায়ের বাঁ হাতে একটা গাড়ু, পায়ের নখে, গোড়ালিতে কাদার দাগ, কানে পৈতা জড়ানো, ডান হাতে কচুপাতায় মোড়া চারটি কুচো চিংড়ি]

বাঁড়ুয্যে। কাল রাত্তিরে এলাম। তামাক খা'দিকি মধু।

[এই বলিয়া গাড়ু রাখিয়া হাতের কুচো চিংড়ি মেলিয়া ধরিলেন]

বাঁড়ুয্যে। সৈরুবী জেলেনীর আক্কেল দেখলি মধু, খপ করে হাতটা আমার ধরে ফেললে হে! কালে কালে কি হল বল দিকি রে, এই কি এক পয়সার চিংড়ি? বামুনকে ঠকিয়ে ক' কাল খাবি মাগী, উচ্ছন্ন যেতে হবে না?

মধু। হাত ধরে ফেললে আপনার?

বাঁড়ুয্যে। আড়াইটি পয়সা শুধু বাকি, তাই বলে খামকা বাজারসুদ্ধ লোকের সামনে হাত ধরবে আমার! কে না দেখলে বল! মাঠ থেকে বসে এসে গাড়ুটি মেজে, নদীতে হাত-পা ধুয়ে মনে করলাম বাজারটা একবার ঘুরে যাই। মাগী এক চুবড়ি মাছ নিয়ে বসে—স্বচ্ছন্দে বললে কিনা কিচ্ছু নেই ঠাকুর, যা ছিল সব উঠে গেছে। আরে, আমার

চোখে ধুলো দিতে পারিস? ডালাটা ফস কোরে তুলে ফেলতেই দেখি না,—অমনি খপ কোরে হাতটা চেপে ধরে ফেললে! তোর সাবেক আড়াইটা আর আজকের একটা—এই সাড়ে-তিনটে পয়সা নিয়ে আমি গাঁ ছেড়ে পালাব? কি বলিস মধু?

মধু। তাও কি হয়!

বাঁড়ুয্যে। তবে তাই বল্ না। গাঁয়ে কি শাসন আছে? নইলে ষষ্ঠে-জেলের ধোপা-নাপতে বন্ধ কোরে চাল কেটে তুলে দেওয়া যায় না? (হঠাৎ রমেশের প্রতি চাহিয়া) বাবুটি কে মধু?.

মধু। আমাদের ছোটবাবু যে! শ্রাদ্ধের দরুন দশটি টাকা বাকি ছিল বলে বাড়ি বয়ে দিতে এসেচেন।

বাঁড়ুয্যে। অ্যাঁ, রমেশ বাবাজী? বেঁচে থাকো বাবা, হাঁ, এসে শুনলাম একটা কাজের মত কাজ করেচ বটে। এমন খাওয়া-দাওয়া এ-অঞ্চলে কখনো হয়নি। কিন্তু বড় দুঃখ রইলো চোখে দেখতে পেলাম না। পাঁচ শালার ধাপ্পায় পড়ে কলকাতায় চাকরি করতে গিয়ে হাড়ীর হাল। আরে ছি, সেখানে মানুষ থাকতে পারে!

মধু। (তামাক সাজিয়া হুঁকা তাঁহার হাতে দিল) তার পরে? একটা চাকরি-বাকরি হয়েছিল ত?

বাঁড়ুয্যে। হবে না? এ কি ধান দিয়ে লেখাপড়া শেখা আমার? কিন্তু হলে কি হবে। যেমন ধোঁয়া, তেমনি কাদা। বাইরে বেরিয়ে গাড়িচাপা না পড়ে যদি ঘরে ফিরতে পারিস ত জানবি তোর বাপের পুণ্যি। কখনো গিয়েছিলি সেখানে?

মধু। আজ্ঞে না। মেদিনীপুর শহরটা একবার দেখেছি—।

বাঁড়ুয্যে। আরে দূর ব্যাটা পাড়াগেঁয়ে ভুত। কিসে আর কিসে! তোর রমেশবাবুকে জিজ্ঞেস কর্ না সত্যি না মিছে।—না মধু, খেতে না পাই ছেলেপুলের হাত ধরে ভিক্ষে করব,—বামুনের ছেলের তাতে কিছু আর লজ্জা নেই,—কিন্তু বিদেশ যাবার নামটি যেন না কেউ আমার কাছে করে। বললে বিশ্বেস করবি নে,সেখানে শুষনি কলমি চালতা আমড়া থোড় মোচা পর্যন্ত কিনে খেতে হয়। পারবি খেতে?—এই একটি মাস না খেয়ে খেয়ে যেন রোগা ইঁদুরটি হয়ে গেছি।

[এই বলিয়া তিনি হুঁকাটা মধুর হাতে দিয়া উঠিয়া গিয়া মধুর তেলের ভাঁড় হইতে খানিকটা তেল বাঁ হাতের তেলোয় লইয়া অর্ধেকটা দুই নাক ও দুই কানের গর্তে ঢালিয়া দিয়া বাকিটা মাথায় মাখিয়া ফেলিলেন]

বাঁড়ুয্যে। বেলা হল, অমনি ডুবটা দিয়ে একেবারে ঘরে যাই। এক পয়সার নুন দে দিকি মধু, পয়সাটা বিকেলবেলা দিয়ে যাব।

মধু। আবার বিকেলবেলা!

[মধু অপ্রসন্নমুখে দোকানে উঠিয়া ঠোঙায় করিয়া নুন দিল]

বাঁড়ুয্যে। (নুন হাতে লইয়া) তোরা সব হলি কি মধু? এ যে গালে চড় মেরে পয়সা নিস দেখি। (এই বলিয়া নিজেই এক খামচা নুন ঠোঙায় দিয়া রমেশের প্রতি মৃদু হাসিয়া) ঐ ত একই পথ,- চল না বাবাজী, গল্প করতে করতে যাই।

রমেশ। আমার একটু দেরি আছে।

বাঁড়ুয্যে। তবে থাক।

[এই বলিয়া গাড়ু লইয়া গমনোদ্যত হইলেন]

মধু। বাঁড়ুয্যেমশাই, সেই ময়দার পয়সা পাঁচ আনা কি অমনি–

বাঁড়ুয্যে। হাঁ রে মধু, তোদের কি লজ্জা-শরম, চোখের চামড়া পর্যন্ত নেই? পাঁচ ব্যাটা-বেটীর মতলবে কলকাতা যাওয়া-আসা করতে পাঁচ-পাঁচটা টাকা আমার গলে গেলো, আর, এই কি তোদের তাগাদা করবার সময় হলো? কারো সর্বনাশ, আর কারো পৌষ মাস বটে! দেখলে বাবা রমেশ, এদের ব্যাভারটা একবার দেখলে?

মধু। (লজ্জিত হইয়া) অনেক দিনের–

বাঁড়ুয্যে। হলই বা অনেক দিনের। এমন কোরে সবাই মিলে পিছনে লাগলে ত আর গাঁয়ে বাস করা যায় না।

[এই বলিয়া তিনি একরকম রাগ করিয়াই নিজের জিনিসপত্র লইয়া চলিয়া গেলেন। এবং পরক্ষণে বনমালী পাড়ুই ধীরে ধীরে প্রবেশ করিয়া রমেশের পায়ের কাছে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন]

রমেশ। আপনি কে?

বনমালী। আপনাদের ভৃত্য, বনমালী পাড়ুই। গ্রামের মাইনার ইস্কুলের প্রধান শিক্ষক।

রমেশ। (সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইয়া) আপনি ইস্কুলের হেডমাস্টার?

বনমালী। আপনার ভৃত্য। দু'দিন আপনাকে প্রণাম জানাতে গিয়েও দেখা হয়নি।

রমেশ। আপনার ইস্কুলের ছাত্রসংখ্যা কত?

বনমালী। বিয়াল্লিশ জন। গড়ে দু'জন পাস হয়। একবার নারাণ বাঁড়ুয্যের সেজছেলে জলপানি পেয়েছিল।

রমেশ। বটে?

বনমালী। আজ্ঞে হাঁ। কিন্তু এ-বছর চাল ছাওয়া না হলে বর্ষার জল আর বাইরে পড়বে না।

রমেশ। সমস্তই আপনাদের মাথায় পড়বে?

বনমালী। আজ্ঞে, হাঁ। কিন্তু সে এখনো দেরি আছে। কিন্তু সম্প্রতি আমরা কেউ তিন মাসের মাইনে পাইনি। মাস্টাররা বলচেন, ঘরের খেয়ে বনের মশা আর বেশীদিন তাড়ানো যাবে না।

রমেশ। আপনার মাইনে কত?

বনমালী। ছাব্বিশ। পাই তেরো টাকা পোনের আনা।

রমেশ। ছাব্বিশ টাকা মাইনে, আর পান তেরো টাকা পোনের আনা, এর মানে?

বনমালী। গভর্নমেন্টের হুকুম কিনা। তাই ছাব্বিশ টাকার রসিদ লিখে সব-ইনস্পেকটারকে দেখাতে হয়। নইলে সরকারী সাহায্য বন্ধ হয়ে যায়।

রমেশ। এতে ছেলেদের কাছে আপনার সম্মানহানি হয় না?

বনমালী। না, এই দেশাচার। তা ছাড়া ছেলেরা আমাকে বাঘের মত ভয় করে। বিতিয়ে পিঠ লাল করে দিই।

রমেশ। দেবার কথাই। আর সব মাস্টারের মাইনে কত?

বনমালী। তেইশ টাকা।

রমেশ। তেইশ! একজনের না তিনজনের?

বনমালী। তিনজনের। ন'টাকা, আট টাকা আর ছ'টাকা। এও বেণীবাবু দিতে নারাজ। তিনি বলেন, আট টাকাটা সাত টাকা হলেই হয় ভাল।

রমেশ। সে ঠিক। কর্তা বুঝি তিনিই?

বনমালী। হাঁ, তিনিই সেক্রেটারি। কিন্তু কখনো একটি পয়সাও দেন না। যদু মুখুয্যেমশায়ের কন্যা রমা,—সতীলক্ষ্মী তিনি—তাঁর দয়া না থাকলে ইস্কুল অনেক দিন পূর্বেই বন্ধ হয়ে যেত।

রমেশ। বলেন কি? এ ত শুনিনি।

বনমালী। হাঁ, শুধু তাঁর দয়াতেই ইস্কুল চলে ছোটবাবু, আর কারো নয়। একটি ভাইও তাঁর এই ইস্কুলে পড়ে। এ-বছর তিনিই চাল ছাইয়ে দেবেন বলেছিলেন, কিন্তু কেন যে দিলেন না বলতে পারিনে। হয়ত কেউ ভাঙ্‌চি দিয়েছে।

রমেশ। তাও হয় নাকি? আচ্ছা, আজ আপনি যান, আপনার বেলা হয়ে যাচ্ছে, কাল আপনাদের ইস্কুল আমি দেখতে যাব।

বনমালী। যে আজ্ঞে। আপনার দয়া হলে আর আমাদের ভাবনা কি?

[এই বলিয়া সে আর একবার হেঁট হইয়া প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিল,
এবং অন্য পথ দিয়া গোপাল সরকার ও ভজুয়া দ্রুতপদে প্রবেশ করিল]

রমেশ। হঠাৎ আপনি এমন ব্যস্ত হয়ে যে সরকারমশাই?

গোপাল। বেণীবাবু ত অত্যন্ত অত্যাচার শুরু করে দিলেন। প্রত্যহ এ ত সহা যায় না ছোটবাবু।

রমেশ। ব্যাপার কি?

গোপাল। কাপাসডাঙার বাইশ-বিঘের বন্দটা এখনো ভাগ হয়নি, মুখুয্যেদের সঙ্গে যৌথ আছে। এক অংশ তাঁদের, এক অংশ বেণীবাবুর, আর এক অংশ আমাদের। সেদিন পাড়ের অতবড় তেঁতুলগাছটা কাটিয়ে তাঁরা দু' অংশে ভাগ কোরে নিলেন, আমাদের একটা টুকরো পর্যন্ত দিলেন না। আপনাকে জানালাম, আপনি বললেন তুচ্ছ একটু কাঠের জন্যে ত আর ঝগড়া করা যায় না!

রমেশ। বাস্তবিক, এত সামান্য জিনিসের জন্যে কি বড়দার সঙ্গে ঝগড়া করা যায় সরকারমশাই?

গোপাল। সেই জোরে আজ বেণীবাবু জোর করে গড়পুকুরের মাছ ধরে নিয়ে গেছেন। বোধ করি মুখুয্যেবাড়িতে এতক্ষণ তার অংশ ভাগ হচ্চে।

রমেশ। কিন্তু ঠিক জানেন এতে আমাদের অংশ আছে?

গোপাল। তবে কি মিছেই এ কাজে মাথার চুল পাকালাম ছোটবাবু?

রমেশ। কিন্তু সবাই যে বলে রমা বড় ধর্মনিষ্ঠ মেয়ে! তাঁকে একবার জিজ্ঞাসা করে পাঠালেন না কেন?

গোপাল। শুনলাম তিনি নাকি হেসে বলেচেন, ছোটবাবুকে বোলো বিষয় তাঁর হাতে দিয়ে একটা মাস-হারা নিয়ে যেখানকার মানুষ সেখানে চলে যেতে। জমিদারি রক্ষে করা ভীতু লোকের কাজ নয়।

রমেশ। তবে বুঝি চুরি করাটাই সে মস্ত সাহসের কাজ বলে ঠাউরেচে? ভজুয়া সঙ্গে তোর লাঠি আছে?

ভজুয়া। (লাঠি আস্ফালন করিয়া) হুজুর।

রমেশ। সমস্ত মাছ গিয়ে কেড়ে নিয়ে আয়। একা পারবি ত?

ভজুয়া। (মাথা নত করিয়া) সির্ফ হুকুমকা নোকর হুজুর!

[এই বলিয়া প্রস্থানোদ্যত হইল]

গোপাল। (অকস্মাৎ অত্যন্ত ভয় পাইয়া) এ যে সত্যি সত্যিই ফৌজদারি বেধে যাবে ছোটবাবু।

রমেশ। উপায় কি?

গোপাল। হঠাৎ একটা কাজ করে ফেলা কি ভাল হবে ছোটবাবু?

রমেশ। তবে কি আপনি করতে বলেন?

গোপাল। আমি বলি,—আমি বলি,—থানায় একটা ডাইরি কোরে,—না হয়, ভাল কোরে একবার জিজ্ঞেসা কোরে—

রমেশ। তবে সেই ভাল সরকারমশাই। আমার মত ভীতু লোকের এর বেশী কিছু করা উচিতও নয়। ও-বাড়ির মাইজীকে চিনিস ত ভজুয়া? চিনিস! বেশ, তাঁকে গিয়ে জিজ্ঞেসা করে আয় গড়পুকুরের মাছে আমার অংশ আছে কিনা। যদি বলেন—আছে, নিয়ে আসিস। যদি বলেন—নেই, শুধু চলে আসবি। আমার নিশ্চয় বিশ্বাস, সরকারমশাই, সামান্য দুটো মাছের জন্যে রমা মিছে কথা বলবে না।

[ভজুয়ার দ্রুতপদে প্রস্থান]

পঞ্চম দৃশ্য

[বেণী ঘোষালের বাটীর অন্তঃপুরে বিশ্বেশ্বরীর গৃহ।
রমা প্রবেশ করিয়া সম্মুখের দাসীকে দেখিতে পাইল]

রমা। জ্যাঠাইমা কোথায় নন্দর মা?

দাসী। পূজোর ঘর থেকে এখনো বার হয়নি। ডেকে দেব দিদি?

রমা। তাঁর পূজোর ব্যাঘাত করে? না না, আমি বসচি। তিনি বেরুলে তাঁকে খবর দিয়ো যে আমি এসেচি।

দাসী। আচ্ছা দিদি।

[দাসী প্রস্থান করিল, এবং পরক্ষণে অতি
সন্তর্পণে পা টিপিয়া যতীন প্রবেশ করিল]

যতীন। দিদি!

রমা। (চমকিয়া মুখ ফিরাইয়া) অ্যাঁ, তুই কোথা থেকে রে?

যতীন। তোমার পেছনে পেছনে এসেচি, তুমি দেখতে পাওনি!

[এই বলিয়া সে রমাকে জড়াইয়া ধরিল]

রমা। কি দুষ্টু ছেলে রে তুই! বেলা হল ইস্কুলে যাবিনে?

যতীন। আমাদের যে আজ ছুটি দিদি।

রমা। ছুটি কিসের রে? আজ ত সবে বুধবার।

যতীন। হলই বা বুধবার! বুধ, বেস্পতি, শুক্কুর, শনি, রবি—এক্কেবারে পাঁচ দিন ছুটি।

রমা। কেন রে যতীন?

যতীন। আমাদের ইস্কুলের চাল ছাওয়া হচ্ছে যে। তার পর চুনকাম হবে, কত বই আসবে,—চার-পাঁচটা চেয়ার-টেবিল এসেচে,—একটা আলমারি, একটা বড় ঘড়ি এসেচে, একদিন তুমি গিয়ে দেখে এসো না দিদি।

রমা। বলিস কিরে?

যতীন। সত্যি দিদি। রমেশবাবু এসেচেন না!—তিনি সব করে দিচ্ছেন। আরও কত কি তিনি করে দেবেন বলেছেন। রোজ দু'ঘণ্টা করে এসে আমাদের পড়িয়ে যান।

রমা। হাঁ রে যতীন। তোকে তিনি চিনতে পারেন?

যতীন। হাঁ—

রমা। কি বলে তাঁকে তুই ডাকিস?

যতীন। ডাকি? আমরা ছোটবাবু বলি।

রমা। (ভাইটিকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া) ছোটবাবু কি রে, তিনি যে তোর দাদা হন।

যতীন। যাঃ–

রমা। যা কি রে? বেণীবাবুকে যেমন বড়দা বলে ডাকিস, এঁকে তেমনি ছোড়দা বলে ডাকতে পারিস নে?

যতীন। আমার দাদা হন তিনি? সত্যি বলচ দিদি?

রমা। সত্যি বলচি রে, তোর ছোড়দা হন তিনি।

যতীন। এতদিন তিনি কোথায় ছিলেন দিদি?

রমা। এতদিন লেখাপড়া শিখতে বিদেশে ছিলেন। তুই বড় হলে তোকেও এমনি কোরে বিদেশে গিয়ে থাকতে হবে যতীন, আমাকে ছেড়ে পারবি ত থাকতে?

যতীন। (বার দুই-তিন অনিশ্চিতভাবে মাথা নাড়িল) ছোড়দার সমস্ত পড়া শেষ হয়ে গেছে দিদি?

রমা। হাঁ ভাই, তাঁর সব পড়া সাঙ্গ হয়ে গেছে।

যতীন। কি করে তুমি জানলে?

রমা। (ক্ষণকাল স্তব্ধ থাকিয়া) নিজের পড়া শেষ না হলে কি কেউ পরের ছেলের জন্যে এত দিতে পারে? এটুকু বুঝি তুই বুঝতে পারিস নে?

যতীন। (মাথা নাড়িয়া জানাইল সে পারে) আচ্ছা, ছোড়দা কেন আমাদের বাড়ি আসেন না দিদি, বড়দা ত রোজ রোজ যান?

রমা। তুই তাঁকে ডেকে আনতে পারিস নে?

যতীন। এখুনি যাব দিদি?

রমা। (ভয়-ব্যাকুল দুই হাতে তাহাকে বুকে জড়াইয়া) ওরে, কি পাগলা ছেলে রে তুই! খবরদার যতীন, কখখনো এমন কাজ করিস নে ভাই, কখখনো করিস নে।

যতীন। তোমার চোখে জল এলো কেন দিদি? তুমি বারণ করলে ত আমি কখখনো কিছু করিনে।

রমা। (চোখ মুছিয়া ফেলিয়া) তা ত কর না জানি। তুমি আমার লক্ষ্মী মানিক ছোট্ট ভাই কিনা,—তাই।

যতীন। বাড়ি চল না দিদি!

রমা। তুই এখন যা, আমি একটুখানি পরে যাবো ভাই।

[যতীন প্রস্থান করিল

[বিশ্বেশ্বরী প্রবেশ করিলেন]

রমা। আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলে জ্যাঠাইমা?

বিশ্বেশ্বরী। এ-সব তোরা কি করেছিস মা? বেণীর চুরি-করার কাজে তুই কি করে সাহায্য করলি রমা?

রমা। আমি ত এ কাজ করতে তাঁকে বলিনি জ্যাঠাইমা!

বিশ্বেশ্বরী। স্পষ্ট বলনি বটে, তবুও অপরাধ তোমার কম হয়নি রমা।

রমা। কিন্তু তখন যে আর উপায় ছিল না জ্যাঠাইমা। ভজুয়া লাঠি-হাতে বাড়ির মধ্যে গিয়ে যখন দাঁড়ালো তখন মাছ ভাগ হয়ে গিয়েছিল। বড়দা তাঁর ভাগ নিয়ে চলে আসছিলেন, পাড়ার পাঁচজনেও দুটো-একটা নিয়ে ঘরে ফিরছিলেন।

বিশ্বেশ্বরী। কিন্তু আসলে মাছ আদায় করতে ভজুয়া যায়নি রমা। রমেশ নিজে মাছ-মাংস ছোঁয় না, এতে তার প্রয়োজন নেই। সে শুধু তোমারই কাছে জানতে পাঠিয়েছিল কাপাসডাঙার গড়পুকুরে তার অংশ আছে কিনা। নেই, এ কথা তুই বললি কি কোরে মা? (রমা অধোমুখে নিরুত্তর)

বিশ্বেশ্বরী। তোমার পরে যে তার কত শ্রদ্ধা, কত বিশ্বাস, সে তুমি জান না বটে, কিন্তু আমি জানি। সেদিন তেঁতুলগাছটা কাটিয়ে তোমরা দু'ঘরে ভাগ কোরে নিলে; গোপাল সরকারের কথাতেও রমেশ কান দিলে না, বললে, আমার ভাগ থাকলে আমি পাবই। রমা কখনো আমাকে ঠকিয়ে নেবে না, কিন্তু কাল যা করেচ মা, তাতে—একটা কথা তোমাকে আজ বলে রাখি মা। বিষয়-সম্পত্তির দাম যত বেশীই হোক, এই মানুষটির প্রাণের দাম তার অনেক বেশী। কারও কথায়, কোন বস্তুর লোভেই, রমা, চারিদিকের আঘাত দিয়ে এ-জিনিসটি তোমরা নষ্ট কোর না। যা হারাবে তা আর কোনদিন পূর্ণ হবে না।

রমেশ।(নেপথ্যে) জ্যাঠাইমা!

বিশ্বেশ্বরী। কে, রমেশ? আয় বাবা এই ঘরে আয়।

[রমেশ প্রবেশ করিতেই রমা আনতমুখে ঈষৎ আড় হইয়া বসিল]

বিশ্বেশ্বরী। হঠাৎ এমন দুপুরবেলা যে রে?

রমেশ। দুপুরবেলা না এলে যে তোমার কাছে একটু বসতে পাইনে জ্যাঠাইমা। তোমার কত কাজ। হাসলে যে? আচ্ছা, তোমার মনে পড়ে, ঠিক এমনি দুপুরবেলায় ছেলেবেলায় একদিন চোখের জলে তোমার কাছে বিদায় নিয়েছিলাম। আজও তেমনি নিতে এলাম। কিন্তু এই বোধ হয় শেষ নেওয়া জ্যাঠাইমা!

জ্যাঠাইমা। বালাই, ষাট! ও কি কথা বাবা? আয় আমার কাছে এসে বোস।

[রমেশ তাঁহার কাছে গিয়া বসিয়া একটুখানি হাসিল, কিন্তু জবাব দিল না। বিশ্বেশ্বরী পরমস্নেহে তাহার মাথায় গায়ে হাত বুলাইয়া দিয়া কহিলেন—]

বিশ্বেশ্বরী। শরীরটা কি এখানে ভাল থাকচে না বাবা?

রমেশ। এ যে খোট্টার দেশের ডাল-রুটির শরীর জ্যাঠাইমা, এ কি এত শীঘ্র খারাপ হয়? তা নয়। তবে, এখানে আমি আর একদিনও টিকতে পারচি নে। আমার সমস্ত প্রাণ যেন কেবলই খাবি খেয়ে উঠচে।

বিশ্বেশ্বরী। শুনে বাঁচলাম বাবা, তোর শরীর খারাপ হয়নি। কিন্তু এই যে তোর জন্মস্থান, এখানে টিকতে পারচিস না কেন বল দেখি?

রমেশ। সে আমি বলবো না। আমি নিশ্চয় জানি, তুমি সমস্তই জান।

বিশ্বেশ্বরী। সব না জানলেও কতক জানি বটে, কিন্তু ঠিক সেই জন্যেই তোকে আমি কোথাও যেতে দেব না রমেশ।

রমেশ। কিন্তু এখানে কেউ আমাকে চায় না জ্যাঠাইমা।

বিশ্বেশ্বরী। চায় না বলেই তোর পালান চলবে না রমেশ। এই যে ডাল-রুটি-খাওয়া দেহের বড়াই করছিলি সে কি শুধু পালানোর জন্যে ! হাঁ রে, গোপাল সরকার বলছিল কি একটা রাস্তা মেরামতের জন্যে তুই চাঁদা তুলছিলি। তার কি হলো?

রমেশ। আচ্ছা, এই একটা কথাই তোমাকে বলি। কোন্ পথটা জান? যেটা পোস্টাফিসের সুমুখ দিয়ে বরাবর স্টেশনে গেছে। বছর-পাঁচেক পূর্বে বৃষ্টিতে ভেঙ্গে এখন একটা প্রকাণ্ড গর্ত হয়ে আছে। লোক পা পিছলে হাত-পা ভেঙ্গে পার হয়, কিন্তু মেরামত করে না। গোটা-কুড়ি টাকা মাত্র খরচ, কিন্তু এর জন্যে আজ আট-দশ দিন ঘুরে ঘুরেও আট-দশটা পয়সা পাইনি। কাল মধুর দোকানের সামনে দিয়ে রাত্রে আসচি, কানে গেল কে একজন আর সকলকে বারণ করে দিয়ে বলচে, তোরা কেউ একটা পয়সাও দিসনে। জুতো পায়ে মসমসিয়ে হাঁটা, দু' চাকার গাড়িতে ঘুরে বেড়ানো,—ওরই ত গরজ। কেউ কিছু না দিলে ও আপনিই সারাবে। না করে, 'বাবু-বাবু' বলে একটুখানি পিঠে হাত বোলানো। বাস্।

বিশ্বেশ্বরী। (হাসিয়া) ওরা অমন বলে। তাই দে না বাপু সারিয়ে। তোর দাদামশায়ের ত ঢের টাকা পেয়েচিস।

রমেশ। (রাগিয়া উঠিয়া) কিন্তু কেন দেবো? আমার ভারী দুঃখ হচ্চে যে, না বুঝে অনেকগুলো টাকা এদের ইস্কুলের জন্যে খরচ করে ফেলেচি। এ-গাঁয়ের কারও জন্যে কিছু করতে নেই। এরা এত নীচ যে এদের দান করলে এরা বোকা মনে করে। ভাল করলে গরজ ঠাওরায়। এদের ক্ষমা করাও অপরাধ। ভাবে, ভয়ে ছেড়ে দিলে।

[শুনিয়া বিশ্বেশ্বরী হাসিতে লাগিলেন]

রমেশ। হাসচ যে জ্যাঠাইমা?

বিশ্বেশ্বরী। না হেসে কি করি বল ত বাছা ? হাঁ রে, রাগ করে তুই এই লোকগুলোকেই ছেড়ে যেতে চাস? আহা, এরা যে কত দুঃখী, কত দুর্বল, কত অবোধ তা যদি জানতিস রমেশ, এদের ওপর অভিমান করতে তোর আপনিই লজ্জা হোতো। (রমার প্রতি) তুমি যে সেই থেকে ঘাড় হেঁট করে বসে আছ মা,—হাঁ রমেশ, তোরা দুই ভাই-বোনে কি কথা-কোসনে?

রমা। (তেমনি অধোমুখে) আমি ত বিরোধ রাখতে চাইনি জ্যাঠাইমা। রমেশদা—

রমেশ । (চমকিয়া) এ কে, রমা নাকি। একলা এসেচেন না সঙ্গে মাসিটিকেও এনেচেন?

বিশ্বেশ্বরী। এ তোর কি কথা রমেশ? তোদের ভাল করে চেনাশুনা নেই বলেই—

রমেশ। রক্ষে কর জ্যাঠাইমা, এর বেশী চেনাশোনার আশীর্বাদ আর কোরো না। বাড়ি গিয়ে মাসীটিকে যদি পাঠিয়ে দেন ত তোমাকে আমাকে দু'জনকেই চিবিয়ে খেয়ে তিনি ঘরে ফিরবেন! বাপরে, পালাই—

বিশ্বেশ্বরী। যাসনে রমেশ, শুনে যা!

রমেশ। (থমকিয়া দাঁড়াইয়া) না জ্যাঠাইমা, আমি সমস্ত শুনেচি। যারা অহঙ্কারের স্পর্ধায় তোমাকে পর্যন্ত মাড়িয়ে চলতে চায় তাদের হয়ে তুমি একটা কথাও বোলো না। তোমাকে অপমান করা আমার সইবে না।

[দ্রুতপদে প্রস্থান]

রমা। (বিশ্বেশ্বরীর মুখের প্রতি চাহিয়া সহসা কাঁদিয়া ফেলিল) তোমাকে অপমান করতে আমি মাসীকে পাঠিয়ে দি, এ কলঙ্ক আমার কেন জ্যাঠাইমা?

বিশ্বেশ্বরী। (রমাকে কাছে টানিয়া লইয়া) তোমাকে ও ভুল বুঝেচে মা, যা সত্যি সে ও একদিন জানবেই জানবে।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[তারকেশ্বরের গ্রাম্য পথ। প্রভাতবেলায় এই মাত্র সূর্যোদয় হইয়াছে। রমা নিকটস্থ কোন একটা পুষ্করিণী হইতে স্নান সারিয়া আর্দ্র-বস্ত্রে গৃহে ফিরিতেছিল, রমেশের সহিত তাহার একেবারে মুখোমুখি দেখা হইয়া গেল। একবার সে মাথায় আঁচল টানিয়া দিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু ভিজা কাপড় টানা গেল না। তখন তাড়াতাড়ি হাতের জলপূর্ণ ঘটিটি নামাইয়া রাখিয়া সিক্ত বসনতলে দুই বাহু বুকের উপর জড় করিয়া হেঁট হইয়া দাঁড়াইল]

রমা। আপনি এখানে যে?

রমেশ। (একপাশে সরিয়া দাঁড়াইয়া) আপনি কি আমাকে চেনেন?

রমা। চিনি। আপনি কখন তারকেশ্বরে এলেন?

রমেশ। এইমাত্র গাড়ি থেকে নেমেচি। আমার মামার বাড়ির মেয়েদের আসবার কথা ছিল, কিন্তু তারা কেউ আসেন নি।

রমা। এখানে কোথায় আছেন?

রমেশ। কোথাও না। পূর্বে কখনো আসিনি, আজকের দিনটা কোনমতে কোথাও কাটাতে হবে। যা হোক একটা আশ্রয় খুঁজে নেবো।

রমা। সঙ্গে ভজুয়া আছে ত?

রমেশ। না, একাই এসেচি।

রমা। বেশ যা হোক! (এই বলিয়া রমা হাসিয়া হঠাৎ মুখ তুলিতেই আবার দু'জনের চোখাচোখি হইল। সে মুখ নীচু করিয়া মনে মনে একটু দ্বিধা করিয়া শেষে বলিল) তবে আমার সঙ্গেই আসুন। (এই বলিয়া সে ঘটিটা তুলিয়া লইয়া অগ্রসর হইতে উদ্যত হইল)

রমেশ। আমি যেতে পারি, কারণ, এতে দোষ থাকলে আপনি কখনই ডাকতেন না। আপনাকে যে আমি চিনি না তাও নয়। কিন্তু কিছুতেই স্মরণ করতে পারচি নে। মনে হচ্ছে কখনো স্বপ্নে দেখে থাকব। আপনার পরিচয় দিন।

রমা। আসুন। পথে যেতে যেতে আমার পরিচয় দেব। স্বপ্ন কবেকার দেখা মনে পড়ে?

রমেশ। না। সঙ্গে আপনার আত্মীয় কেউ নেই?

রমা। না, দাসী আছে, সে বাসায় কাজ করচে, চাকরটা গেছে বাজারে। তা ছাড়া আমি ত প্রায়ই এখানে আসি,—সমস্তই চিনি।

রমেশ। কিন্তু আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্চেন কেন?

রমা। নইলে আপনার খাওয়া-দাওয়ার ভারী কষ্ট হবে।

রমেশ। হলই বা। তাতে আপনার কি?

রমা। পুরুষমানুষকে সব বুঝোন যায়, যায় না শুধু এই কথাটি। আমি রমা!

রমেশ। রমা?

রমা। হাঁ, যার সঙ্গে পরিচয় থাকাও আপনার ঘৃণার বস্তু—সেই।

রমেশ। কিন্তু আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?

রমা। আমার বাসায়। সেখানে মাসী নেই, ভয় নেই, আসুন।

[উভয়ের প্রস্থান]

[পরক্ষণে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের প্রবেশ। নাপিত ও তাহাকে দ্রুতপদে অনুসরণ করিয়া

অপর এক ব্যক্তি। মুখে প্রচুর দাড়ি-গোঁফ ও মাথায় সুদীর্ঘ কেশ, খানিকটা ক্ষুর দিয়া কামানো। এই লোকটি মানত করিয়া ঠাকুরের কাছে চুল-দাড়ি দিতে আসিয়াছিল]

যাত্রী। (ব্যস্তভাবে) নাপিত, নাপিত, তুমি নাপিত নাকি হে? দাও ত দাদা এইটুকু কামিয়ে। খপ্ কোরে একটা ডুব দিয়ে বাবার পূজোটুকু সেরে দিয়ে আসি। বাবার থান, নইলে দুটো পয়সার মজুরি নয়,—এই সিকিটি নিয়ে দাও দাদা খপ্ করে। সাড়ে বারোটার গাড়ি ধরতে হবে,—ঘরে ছেলেটার আবার দু'দিন জ্বর। দাও দাও, এখানেই বসে যাবো নাকি?

নাপিত। (সিকিটি হাতে লইয়া বেশ করিয়া পরীক্ষা করিয়া পরে ট্যাঁকে গুঁজিয়া বারদুই তাহার আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া) এই যে! দাড়ি-চুল কে এঁটো করে দিয়েচে দেখচি?

যাত্রী। এঁটো? এঁটো কি রকম? দেখচো বাবার দাড়ি-চুল, এ কি আমার? এঁটো কি রকম?

নাপিত। (হাত দিয়া দেখাইয়া) এই ত খাবলে দুই-ই এঁটো করে দিয়েচে।

যাত্রী। এঁটো হয়ে গেল? এক ব্যাটা নাপতে সিকিটি হাতে নিয়ে এইটুকু ক্ষুর বুলিয়ে দিয়ে বলে কর্তার সিকিটি অমনি দাও। বললুম, কর্তা আবার কে? এই তো গদিতে পাঁচ-সিকে জমা দিয়ে হুকুম নিয়ে আসচি। বলে, দেখ গে তবে আর কোথাও। সিকি ত গেছেই, রাগ করে উঠে এলুম। দাও দাদা, তোমার বাপ-মায়ের কল্যাণে–

নাপিত। আর গণ্ডা-আষ্টেক পয়সা বার কর দিকি। তার চার-আনা, কর্তার চার-আনা।

যাত্রী। আবার তার চার-আনা, কর্তার চার-আনা? মানুষ-জনকে কি পাগল করে দেবে নাকি? দাও তবে আমার সিকি ফিরিয়ে, আমি তার কাছে গিয়েই কামাব।

নাপিত। যাবে যাও না। আমি কি তোমাকে ধরে রেখেচি নাকি?

যাত্রী। (রাগতভাবে) সিকি ফিরিয়ে দাও বলচি।

নাপিত। কিসের সিকি শুনি? এতক্ষণ দর-দস্তুর করলি মাগ্‌না নাকি?

যাত্রী। আবার তুই- তোকারি?

নাপিত। ওঃ–গুরুঠাকুর এসেচেন! এ তারকেশ্বর থান, মনে রাখিস! চোখ রাঙাবি ত গলাধাক্কা খাবি। কোন্ বাবা তোকে কামিয়ে দেয় যা না।

[ছেলের হাত ধরিয়া একটি প্রৌঢ়াগোছের স্ত্রীলোক ও তাহার
আঁচল ধরিয়া মন্দিরের দুইজন কর্মচারীর দ্রুতপদে প্রবেশ]

১ম কর্মচারী। অ্যাঁ! বাবাকে ঠকানো! ঠকানোর আর জায়গা পাসনি মাগী? মোটে পাঁচসিকে মানোত?

প্রৌঢ়া। (কাতর-কণ্ঠে) না বাবা ঠকাই নি। যা মানোত করেছিলুম তাই জমা দিয়েচি।

১ম কর্মচারী। কবে মানোত করেছিলি, বল, বল, শুনি?

প্রৌঢ়া। বছর-তিনেক আগে, সেই বানের সময়। সত্যি বলচি বাবা–

২য় কর্মচারী। সত্যি বলচ? মিথ্যেবাদী কোথাকার। বছর-তিনের মধ্যে ঘরে আর ব্যারাম-স্যারাম হয়নি? আর মানত করবার দরকার হয়নি? কখখনো না। দে মাগী বুকে হাত দে। মনে করে দ্যাখ। ছেলেপুলে নিয়ে ঘর করিস–এ যে-সে দেবতা নয়, স্বয়ং তারকনাথ।

প্রৌঢ়া। (অত্যন্ত ভয় পাইয়া) শাপ-মন্যি দিও না বাবা, এই আর একটি টাকা নিয়ে–

১ম কর্মচারী। (হাত পাতিয়া গ্রহণ করিয়া) একটি টাকা? অন্ততঃ আরো পাঁচটি টাকা মানোত করেছিলি। দ্যাখ ভেবে। বাবার কৃপায় আমরা সব জানতে পারি, আমাদের ঠকান যায় না।

২য় কর্মচারী। দে না মা টাকা ক'টা ফেলে! ছেলেপুলে নিয়ে ঘর করিস, কেন আর বাবার কোপে পড়বি? তোর ব্যাটার কল্যাণে দে, দিয়ে দে ফেলে।

প্রৌঢ়া। (কাঁদ-কাঁদ হইয়া) টাকা যে আর নেই বাবা। কোথায় পাব টাক।

১ম কর্মচারী। কেন ঐ ত তোর গলায় সোনার কবচ রয়েচে। ওটা পোদ্দারের দোকানে রেখে কি আর পাঁচটা টাকা পাবিনে? সঙ্গে না হয় লোক দিচ্ছি, দোকান দেখিয়ে দেবে, তার পরে একদিন ফিরে এসে খালাস করে নিয়ে যাবি।

[একজন স্ত্রীলোককে ঘিরিয়া পাঁচ-সাত জন ভিখারিণীর প্রবেশ]

১ম ভিখারিণী। দে মা তোর ব্যাটা-বেটীর কল্যাণে–

২য় ভিখারিণী। দে মা একটি পয়সা তোর মেয়ে-জামাইয়ের কল্যাণে–

৩য় ভিখারিণী। দে মা তোর বাপ-মায়ের–

৪র্থ ভিখারিণী। দে মা তোর স্বামী-পুত্তুরের–

[সকলে মহা ঠেলাঠেলি টানাটানি করিতে লাগিল]

চুলওয়ালা যাত্রী। চাইনে দাড়ি-চুল দিতে। চাইনে মানত শোধ করতে।

মানতওয়ালা প্রৌঢ়া। এ যে আমার ইষ্টি-কবচ বাবা! বাঁধা দেব কি করে?

ভিখারীতাড়িত স্ত্রীলোক। ওগো কি সর্বনাশ! কে আমার আঁচল কেটে নিলে?

ভিখারীর দল। তোর স্বামী-পুত্তুরের কল্যাণে দে একটা পয়সা। দে একটা আধলা–

১ম কর্মচারী। ব্যাটা-বেটী নিয়ে ঘর করিস বাছা! বাবার থান!

নাপিত। কামাবে যে গো?

যাত্রী। কামাবো? রইল তারকনাথ মাথায়। চললুম ঘরে ফিরে।

[প্রস্থান

ভিখারীতাড়িত স্ত্রীলোক। ঘরে ফিরব কি করে গো! কে আঁচল কেটে নিলে।

ভিখারীর দল। দে মা একটা পয়সা। দে মা একটা আধলা।

[বলিতে বলিতে ঠেলিয়া লইয়া গেল]

মানতওয়ালা প্রৌঢ়া। দোহাই বাবা তারকনাথ, আমার ইষ্টি-কবচটি আর নিয়ো না।

[ছেলের হাত ধরিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান]

১ম কর্মচারী। এক টাকার বেশী হোল না আদায়।

২য় কর্মচারী। নেই মাগীর আর কিছু।

[প্রস্থান

নাপিত। যাক চার গণ্ডা পয়সাই কোন্ মাথা খুঁড়লে মেলে?

[প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

[তারকেশ্বরের বাসাবাটী। সামান্য রকমের একটা বিছানা পাতা, তাহাতে বসিয়া রমেশ। রমা ব্যস্ত হইয়া প্রবেশ করিল]

রমা। বেশ আপনি! রান্নাঘরে যেই গেছি আর একটু তরকারি আনতে, অমনি উঠে হাত-মুখ ধুয়ে
দিব্যি ভালমানুষটির মত বিছানায় এসে বসেচেন! কেন উঠলেন বলুন ত?

রমেশ। ভয়ে।

রমা। ভয়ে! কার ভয়ে! আমার?

[এই বলিয়া সে অদূরে উপবেশন করিল]

রমেশ। সে ভয় ছিলই, তা ছাড়া আর একটা আছে। আজ জ্বরের গত ঠেকচে।

রমা। জ্বরের মত ঠেকচে? এ কথা আগে বললেন না কেন? স্নান করে ভাত খেতে বসলেনই বা কোন্ বুদ্ধিতে?

রমেশ। খুব সহজ বুদ্ধিতে। যে আয়োজন, এবং যে যত্ন করে খেতে দিলে তাকে না বলে ফেরাবোই বা কোন্ সুবিবেচনায়? ভাবলাম, হোক গে জ্বর,—ওষুধ খেলেই সারবে। কিন্তু এ অন্ন না খেয়ে যদি ফাঁকে পড়ি, এ ফাঁক এ জীবনে আর ভরবে না।

রমা। যান এই বিদেশে সত্যিই যদি জ্বর হয়ে পড়ে, বলুন ত সে কত বড় অন্যায়?

রমেশ। অন্যায় ত আছেই। কিন্তু যে-রানীকে এতটুকু দেখে গেছি, তার স্বহস্তের রান্না ত্যাগ করাটাই কি কম অন্যায় হতো?

রমা। তবু ঐ কথা! এ বিদেশে ত কোন আয়োজনই করতে পারিনি।

রমেশ। আয়োজনের কথা কে ভাবচে? ভাবচি শুধু যত্নের কথাটুকু। এ আমি কোথায় পেতাম?

রমা। (সলজ্জে) কেন, আপনাকে যত্ন করবার লোকের কি অভাব আছে নাকি?

রমেশ। কোথায় পাব বল ত? ছেলেবেলায় মা মারা গেলেন, তার পরে জ্যাঠাইমার হাত থেকে গিয়ে পড়লাম বহু দূরে মামার বাড়িতে। মামীমা বেঁচে নেই, সমস্ত বাড়িটাই যেন হোটেল। সেখান থেকে পড়তে গেলাম এলাহাবাদে—সেও হোটেল। তার পরে গেলাম ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে। সেখানে বহুকাল কাটল, কিন্তু ছেলেবেলার সেই হোটেলবাসের দুঃখ আর ঘুচল না। খেতে হয় খাও,—বাধা দেবারও শত্রু নেই, এগিয়ে দেবারও মিত্র নেই।

[রমা নীরব]

রমেশ। শরীর অসুস্থ, সাধ মিটিয়ে আজ খেতে পারলাম না, তবু মনে হচ্চে যেন জীবনের এই প্রথম সুপ্রভাত, এ জীবনের সমস্ত ধারাটা যেন একটা বেলার মধ্যেই একেবারে বদলে গেল।

রমা। (অধোমুখে) কি সমস্ত বাড়িয়ে বলচেন বলুন ত?

রমেশ। বাড়ানোর শক্তি থাকলে বাড়াতাম, কিন্তু সে সাধ্য নেই।

রমা। ভাগ্যে নেই, নইলে এর বেশি শক্তি থাকলে আমাকে ছুটে পালাতে হতো। আমারও ভাগ্য ভাল যে, ঘরে ফিরে গিয়ে নিন্দে করবেন না, বলে বেড়াবেন না যে ওদের রমা এমনি যে আমাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে পেটভরে দুটো খেতেও দেয়নি।

রমেশ। না রানী, নিন্দে করব না, সুখ্যাতি করেও বেড়াব না। আজকের দিনটা আমার নিন্দে-সুখ্যাতির বাইরে। বাস্তবিক, খাওয়া জিনিসটার মধ্যে যে পেট-ভরানোর অতিরিক্ত আরও কিছু আছে, আজকের পূর্বে এ কথা যেন আমি জানতামই না।

রমা। আজই বুঝি প্রথম জানলেন?

রমেশ। তাই ত জানলাম।

রমা। কিন্তু এরও ঢের বেশি জানবার আছে। সেদিনটায় আমাকে কিন্তু একটা খবর পাঠিয়ে দেবেন।

রমেশ। এ কথার মানে?

রমা। সব কথার মানে যে জানতেই হবে, তারই বা কি মানে আছে রমেশদা? আচ্ছা, সত্যি বলুন ত, আমাকে কি তখন একেবারে চিনতেই পারেন নি?

রমেশ। কি করেই বা পারব বল ত? সেই ছেলেবেলায় দেখা। ফিরে এসে ত তোমার মুখ দেখতে পাইনি। যখনি চেষ্টা করেচি তখনি হয়ত মুখ ফিরিয়ে নিয়েচ, না হয় ত অন্যদিকে চেয়ে আছ। তাই ত আজ হঠাৎ মনে হয়েছিল, এ মুখ বোধ হয় কখনো স্বপ্নে দেখে থাকব। এমন স্বপ্ন ত–

রমা। আচ্ছা, আপনি রাত্রে কি খান?

রমেশ। যা জোটে তাই।

রমা। আচ্ছা, আপনি এত অগোছালো কেন বলুন ত? শুনি জিনিসপত্র কোথায় থাকে কোথায় যায়, কোন ঠিকানা নেই। কিছুর ওপরেই যেন একটা মায়া-মমতা নেই। সমস্তই যেন শূন্যে ভেসে বেড়ায়।

রমেশ। এত নিন্দে কার কাছে শুনলে?

রমা। সে শুনেই বা আপনার হবে কি? ফিরে গিয়ে তার সঙ্গে ঝগড়া করবেন নাকি?

রমেশ। আমি কি কেবল ঝগড়া করেই বেড়াই?

রমা। তাই ত করেন। এসে পর্যন্ত আমার সঙ্গে ত কেবল ঝগড়া করেই বেড়াচ্চেন।

মাসীই কি বাড়ির মালিক নাকি, না আমি তাঁকে শিখিয়ে দিই যে, তিনি বারণ করেচেন বলেই আমাদের মুখ-দেখা পর্যন্ত বন্ধ করেচেন? পুকুরের মাছ কি আমি চুরি করেছিলাম যে, আমার কাছে পাঠিয়েছিলেন তার কৈফিয়ত চাইতে?

রমেশ। কৈফিয়ত ত নয়, একটা জবাব। কিন্তু সে জবাবের ত কোন অমর্যাদা হয়নি রানী!

রমা। হয়নি। কিন্তু, হয়নি বলেই ত তার সমস্ত অমর্যাদার বোঝা গিয়ে চেপেচে আজ আমার মাথায়। এর ভার কি আমি জানিনে, না এ শাস্তি আমি বুঝিনে? গ্রামে যে যা করবে আপনার বিরুদ্ধে, আমিই কি হব তার দায়ী? আপনার সমস্ত বিতৃষ্ণা কি গিয়ে পড়বে শুধু আমারই ওপরে? এই ন্যায় বুঝি শিখে এসেচেন বিদেশ থেকে?

[দাসীর প্রবেশ]

দাসী। দিদি, নটবর কি জিনিসপত্র সব বাঁধবে? নইলে ছ'টার গাড়ি ত ধরা যাবে না।

রমা। তার তাড়াতাড়ি কি কুমুদা?

দাসী। যে মেঘ করেচে দিদি, রাত্তিরে হয়ত ভয়ানক জল হবে।

রমা। হলই বা। মাঠে বসে ত আর তোরা নেই।

দাসী। না, তাই বলচি।

[দাসীর প্রস্থান]

রমেশ। তোমাদের বুঝি সন্ধ্যার গাড়িতে যাবার কথা?

রমা। হাঁ। আর আপনার?

রমেশ। আমার? আমার ত কোনমতে আজকের দিনটা এখানে থাকতেই হবে।

রমা। একে শরীর ভাল নয়, তাতে বর্ষাকাল, থাকবেন কোথায়?

রমেশ। যেখানে হোক। যারা সব পূজো দিতে আসে তারা থাকে কোথায়?

রমা। তাদের জায়গা আছে। আপনি ত পূজো দেবেন না, আপনাকে থাকতে দেবে কেন?

রমেশ। (হাসিয়া) তাদের গায়ে কি নাম লেখা থাকে নাকি?

রমা। (হাসিয়া) থাকে। ভক্ত-লোকেরা বাবার কৃপায় পড়তে পারে। অভক্তদের তারা দূর করে দেয়। বিছানা-টিছানা কিছুই সঙ্গে আনেন নি ত?

রমেশ। না। বিছানা তাঁদের আনবার কথা।

রমা। খাসা ব্যবস্থা। দেহ অসুস্থ, আকাশে জল এলো বলে, সঙ্গে চাকর নেই, একটা বিছানা নেই, খাবার বন্দোবস্ত নেই, অথচ চিন্তার বালাইটুকু পর্যন্ত নেই। কারা কোথা থেকে কবে আসবেন, তার প্রতি নির্ভর। একেবারে পরমহংস অবস্থা। এমন হোল কি করে?

রমেশ। যাদের কেউ কোথাও নেই, তাদের আপনিই হয়।

রমা। তাই ত দেখচি। না হয় আজ এই বাড়িতেই থাকুন।

রমেশ। কিন্তু যাঁর বাড়ি–

রমা। তাঁর আপত্তি নেই। অপদার্থ মানুষগুলোকে তিনি দয়া করেন। থাকতেও দেন।

রমেশ। তোমাকে কিন্তু এই বিছানাটা রেখে যেতে হবে রমা।

রমা। তা যাব। কিন্তু ফিরিয়ে দেবেন,–হারিয়ে ফেলবেন না যেন।

রমেশ। বিছানা হারাব কি রকম? আমাকে তুমি কি যে ভাব তার ঠিকানা নেই। কে আমার সম্বন্ধে তোমার মন একেবারে বিগড়ে দিয়েচে।

রমা। (হাসিয়া) কে আর দেবে, হয়ত মাসীই দিয়েচে। কিন্তু তিনি এখানে নেই, আপনি নির্ভয়ে বিশ্রাম করুন। আমি ততক্ষণ কাজকর্ম একটু সেরে নিই।

[এই বলিয়া সে যাইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইল]

রমেশ। যাঁর বাড়ি তাঁর সঙ্গে একটা পরিচয় না হলে–

রমা। তাঁর সঙ্গে আপনার এই এতটুকু বয়স থেকে পরিচয় আছে। ভাবনার কারণ নেই, ছেলেবেলায় যাকে রানী বলে ডাকতেন–এ তারই বাড়ি।

রমেশ। বাড়ি তোমার? এখানে বাড়ি কিসের জন্যে?

রমা। বললাম ত। জায়গাটা আমার বড় ভাল লাগে, প্রায় আসি,–তাই।

রমেশ। ঠাকুর-দেবতার প্রতি তোমার খুব ভক্তি, না?

রমা। একে আর ভক্তি বলে না। তবু যতদিন বেঁচে আছি চেষ্টা করতে হবে ত?

[দাসীর প্রবেশ]

দাসী। টিপটিপ করে বৃষ্টি শুরু হলো দিদি, যেতে আজ কষ্ট হবে।

রমা। তবে না-ই গেলি আজ। নটবরকে বলে দে, কাল যাওয়া হবে।

দাসী। বাঁচি তা হলে। কিন্তু যাবার কথা, বাড়িতে যে তাঁরা ভাববেন?

রমা। মাঝে মাঝে একটু ভাবা ভাল কুমুদা। তুই যা, আমি যাচ্ছি।

[দাসীর প্রস্থান]

রমেশ। কেবল আমার জন্যেই তোমাদের যাওয়া হোল না।

রমা। আপনার জন্যে নয়, আপনার অসুখের জন্যে। মুখ দেখে বেশ বোঝা যাচ্চে, হয়ত জ্বর হবে। এ অবস্থায় ফেলেই বা যাই কি করে?

রমেশ। আমি ত তোমার কেউ নই রমা, বরঞ্চ পথের কাঁটা। তবু এক গ্রামের লোক বলে যে যত্ন আজ তোমার কাছে পেলাম তা মুখে বলবার নয়।

রমা। তা হলে না-ই বা বললেন। আর দু'দিন বাদে ভুলে গেলেও অভিযোগ করব না।

[এই বলিয়া সে চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল]

রমেশ। তোমাকে আশীর্বাদ করি রমা, তুমি সুখী হও, দীর্ঘজীবী হও–

রমা। (সহসা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া) এইবার কিন্তু সত্যিই রাগ করব রমেশদা। আমি বিধবা,–আমাকে দীর্ঘজীবী হতে বলা শুধু অভিশাপ দেওয়া। কোন শুভাকাঙ্ক্ষীই কোনদিন এ আশীর্বাদ আমাদের করে না। এখন আমি চললাম।

[দ্রুতপদে প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য

[গ্রাম্য পথ। সময় অপরাহ্ণপ্রায়। তিন দিন অত্যধিক ও অবিশ্রাম বারিপাতে পুষ্করিণী-খাল-বিল-নালা সমস্তই জলে পরিপূর্ণ হইয়া গেছে। পথ অতিশয় কর্দমাক্ত। ক্ষণকাল মাত্র বৃষ্টির বিরাম পড়িয়াছে। লাঠি ও ছাতি হাতে বেণী ও গোবিন্দ প্রবেশ করিল। দুর্গম পথে চলার চিহ্ন তাহাদের সর্বাঙ্গে বিদ্যমান]

গোবিন্দ। (অন্তরাল হইতেই উচ্চকণ্ঠে) বলি, কিসের এত খাতির হে! কুটুমের দল এয়েচেন আবদার নিয়ে বাঁধ কাটিয়ে জল নিকেশ করে দাও, মাঠ হেজে যাবে! গেল, গেলই! ছোটলোক ব্যাটাদের আস্পর্ধার কথা শুনে হাসব কি কাঁদব ভেবে পাইনে বড়বাবু!

বেণী। বল ত খুড়ো! চাষা ব্যাটাদের একশো বিঘের মাঠ হেজে যাবে, জল বার করে দাও। সুমুখের বিলটার যে বছর সালিয়ানা দুশো টাকার জলকর বিলি হয়। একটা মাছও কি তা হলে থাকবে?

গোবিন্দ। তাও কি কখনো থাকে? ছোটলোক ব্যাটারা, দুটো টাকার মুখ কখনো একসঙ্গে দেখিস নে তোরা,—জানিস, দু-দুশো টাকার লোকসান কাকে বলে? বলি, লোক-জন সব মোতায়েন রেখেছ ত? লুকিয়ে-চুরিয়ে ব্যাটারা কোথাও কেটেকুটে দেবে না ত? বলা যায় না বড়বাবু! প্রাণের দায়ে শালারা সব পারে।

বেণী। দরোয়ান আর গোপাল লস্করকে পাঠিয়েচি পাহারা দিতে। আর খবর পাঠিয়েচি রমার পীরপুরের প্রজা আকবর লেঠেল আর তার দুই ব্যাটাকে। একশো জনের মোয়াড়া আটকাতে পারে তারা।

গোবিন্দ। ঠিক করেচ বাবা। কলকেটি সেজে ফুঁ দিচ্চি, আর তোমার চাকর গিয়ে হাজির। বলি, ভিজতে ভিজতে কেন রে হরি? বলে, বড়বাবু তোমাকে ডাকচে। মিথ্যে

বলব না বাবা, হাতের হুঁকো হাতে রইল, একবার টানবার সময় হল না। ছাতি আর ছড়িটি হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। তোমার খুড়ী বললে এ দুর্যোগে যাও কোথা? বললুম, থাম্ মাগী, আবার পিছু ডাকে! দেখচিস বড়বাবু ডাকতে পাঠিয়েচে না? তার আবার সুযোগ-দুর্যোগ কি?

বেণী। জান ত খুড়ো তোমার পরামর্শ ছাড়া আমি এক-পা কোথাও চলিনে। আমার কাছে কান্নাকাটি কোরে যখন হোল না, তখন ব্যাটারা গেল ছোটবাবুর কাছে দরবার করতে। হোঁৎকা-গোঁয়ার, ওর কি! হয়ত বলে বসবে, হোকগে লোকসান আমাদের, দে তোরা বাঁধ কেটে।

গোবিন্দ। পারে, ও হারামজাদা সব পারে বড়বাবু। (গলা ছোট করিয়া) বলি রমাকে একটা খবর দিয়ে রেখেচ ত? সে ছুঁড়ীরও সব সময়ে মেজাজের ঠিক থাকে না। গরীব-দুঃখীর কান্না দেখলে হয়ত বা সায় দিয়েই বসবে।

বেণী। নাঃ—সে ভয় নেই খুড়ো, তাকে আমি সকালবেলাতেই টিপে দিয়ে রেখেচি। কাল রাত্তির থেকেই একটা কানাঘুষো শুনচি কিনা! ঐ যে আবার ক' ব্যাটা এই দিকেই আসছে।

[কয়েকজন কৃষকের প্রবেশ। তাহাদের সর্বাঙ্গ
জলে ও কাদায় একাকার হইয়া গেছে]

কৃষকেরা। (সমস্বরে) দোহাই বড়বাবু, গরীবদের বাঁচান। এ আবাদ পচে গেলে আমরা ছেলেপুলে নিয়ে অনাহারে মরব।

গোবিন্দ। কেন হে সনাতন, মুরুব্বিরা ছুটে গেলেন যে ছোটবাবুর কাছে! এখন বাঁচান না তিনি!

সনাতন। যে গেছে সে গেছে গাঙ্গুলীমশাই, আমরা এই পা-দুটিই জানি, এই পা ধরেই পড়ে থাকব। (বেণীর পদতলে পড়িয়া ক্রন্দন)

২য় কৃষক। (বেণীর পদতলে পড়িয়া) আমাদের রাখতে হয় রাখুন, মারতে হয় মারুন,—পা আমরা ছাড়ব না।

বেণী। (জোর করিয়া পা ছাড়াইয়া লইয়া) যা—যা—আমি দু'-দুশো টাকার জলকর নষ্ট করতে পারব না। চল খুড়ো আমারা যাই, আমাদের আরও কাজ আছে।

[বেণী ও গোবিন্দ যাইতে উদ্যত হইল]

কৃষকেরা। বড়বাবু, গাঙ্গুলীমশাই, তবে কি সত্যি সত্যিই আমরা মারা যাব?

গোবিন্দ। (ফিরিয়া দাঁড়াইয়া মুখ বিকৃত করিয়া) মারা যাবি কি যাবিনে তার আমরা কি জানি?

[উভয়ের প্রস্থান]

কৃষকেরা। হা ভগবান! দুঃখীদের কি তবে সত্যিই মারবে? ওপরে বসে সব দেখচ, তবু কোন উপায় করে দেবে না?

[সকলের দ্রুতবেগে প্রস্থান]

চতুর্থ দৃশ্য

[রমার বহির্বাটী। কাল সন্ধ্যা। প্রাঙ্গণের একদিকে চণ্ডীমণ্ডপের কিয়দংশ দেখা যাইতেছে এবং অন্যদিকে ছোট একটি তুলসীমঞ্চ। রমা সন্ধ্যাদীপ হাতে ধীরে ধীরে প্রবেশ করিয়া মঞ্চমূলে প্রদীপ রাখিয়া গলায় আঁচল দিয়া প্রণাম করিল। এমনি সময়ে তাহার আনত মাথার কাছে নিঃশব্দ পদক্ষেপে রমেশ আসিয়া দাঁড়াইল]

রমা। (মুখ তুলিয়া অকস্মাৎ রমেশকে দেখিয়া বিস্ময়ে) এ কি আপনি যে!

রমেশ। অত্যন্ত প্রয়োজনে আসতে হলো রমা।

রমা। (ঈষৎ হাসিয়া) বেশ আসা! কিন্তু হঠাৎ কেউ যদি দেখে ত ভাববে আমি বুঝি প্রদীপ জ্বেলে আপনাকেই নমস্কার করছিলাম। এমনি কোরে বুঝি দাঁড়ায়?

রমেশ। রমা, আমি শুধু তোমার কাছেই এসেচি।

রমা। (হাসিমুখে) সে আমি জানি। নইলে কি মাসীর কাছে এসেচেন আমি বলচি? (এই বলিয়া সে প্রদীপ হাতে লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল) কি আদেশ বলুন?

রমেশ। তুমি নিশ্চয়ই সব শুনেচ। জল বার করে দেবার জন্যে তোমার মত নিতে এসেচি।

রমা। আমার মত?

রমেশ। হ্যাঁ, তোমার মত নিতেই ছুটে এসেচি রমা। আমি নিশ্চয় জানি দুঃখীদের এত বড় বিপদে তুমি কখনোই না বলতে পারবে না।

রমা। জল বার কোরে দেওয়াই উচিত বটে, কিন্তু কি কোরে হবে রমেশদা, বড়দার যে মত নেই।

[বেণী ও গোবিন্দর প্রবেশ]

বেণী। না, আমার মত নেই। কেন থাকবে? দু-তিনশো টাকার মাছ বেরিয়ে যাবে সে খবরটা রেখেছ কি? এ টাকাটা কি চাষারা দেবে?

রমেশ। চাষারা গরীব, টাকা তারা কোথায় পাবে? কথাটা একবার বুঝে দেখুন বড়দা।

বেণী। তা দেখেচি। কিন্তু নাহক এত টাকা আমরাই বা কেন লোকসান করতে যাব এ কথাটাও ত বুঝে উঠতে পারিনে রমেশ। (গোবিন্দর প্রতি) খুড়ো, এমনি করে ভায়া আমার জমিদারি রাখবেন! ওহে রমেশ, হারামজাদারা সকাল থেকে এতক্ষণ আমার ওখানে পড়েই মড়া-কান্না কাঁদছিল,—আমি জানি সব। বলি, তোমার সদরে কি দারোয়ান নেই? তার পায়ে নাগরা জুতো নেই? যাও ঘরে গিয়ে সেই ব্যবস্থা করগে, জল আপনি নিকেশ হয়ে যাবে।

[এই বলিয়া নিজের রসিকতায় গোবিন্দর সহিত
একযোগে হিঃ হিঃ হাঃ হাঃ—করিয়া হাসিতে লাগিল]

রমেশ। কিন্তু ভেবে দেখুন বড়দা, আমাদের তিন ঘরের দু'শো টাকা মাত্র লোকসান বাঁচাতে গিয়ে গরীবদের সারা বছরের অন্ন মারা যাবে। যেমন করে হোক তাদের পাঁচ-সাত হাজার টাকা ক্ষতি হবেই।

বেণী। হল হলই। তাদের পাঁচ হাজারই যাক আর পঞ্চাশ হাজারই যাক, এই গোটা সদরটা খুঁড়ে ফেললেও ত পাঁচটা পয়সা বার হবে না ভায়া, যে, ও-শালাদের জন্যে দু-দু'শ টাকা উড়িয়ে দিতে হবে?

রমেশ। এরা সারা বছর খাবে কি?

বেণী। (হাসিয়া, মাথা নাড়িয়া, থুথু ফেলিয়া, অবশেষে স্থির হইয়া) খাবে কি? দেখবে ব্যাটারা যে-যার জমি বন্ধক রেখে আমাদের কাছেই টাকা ধার করতে ছুটে আসবে। ভায়া, মাথাটা একটু ঠাণ্ডা কোরে চল। কর্তারা এমনি কোরেই বাড়িয়ে গুছিয়ে এই যে এক-আধ টুকরো উচ্ছিষ্ট ফেলে রেখে গেছেন, এই আমাদের নেড়ে-চেড়ে, গুছিয়ে-গাছিয়ে, খেয়েদেয়ে আবার ছেলেদের জন্যে রেখে যেতে হবে। ওরা খাবে কি? ধার-কর্জ করে খাবে। নইলে আর ব্যাটাদের ছোটলোক বলেচে কেন?

গোবিন্দ। এ যে মুনি-ঋষিদের শাস্ত্রবাক্য বাবাজী, এ ত আর তোমার আমার কথা নয়!

রমেশ। বড়দা, আপনি যখন কিছুই করবেন না স্থির করেচেন তখন তর্ক কোরে আর লাভ নেই।

বেণী। না নেই। (রমার প্রতি) তোমার পীরপুরের আকবর আলি আর তার ব্যাটাদের খবর পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে রমা। (গোবিন্দর প্রতি) চল খুড়ো, আমরা ও-দিকটা একবার দেখেশুনে আসি গে। সন্ধ্যাও হল।

গোবিন্দ। চল বাবা চল!

[উভয়ের প্রস্থান]

রমেশ। হুকুম দাও রমা, ওঁর একার অমতেই এত বড় অন্যায় হতে পারে না। আমি এখুনি গিয়ে বাঁধ কাটিয়ে দেব।

রমা। কিন্তু মাছ আটকে রাখার কি বন্দোবস্ত করবেন?

রমেশ। এত জলে কোন বন্দোবস্ত হওয়াই সম্ভবপর নয়। এ ক্ষতি আমাদের স্বীকার করতেই হবে। না হলে গ্রাম মারা যায়।

[রমা নীরব]

রমেশ। তা হলে অনুমতি দিলে?

রমা। না। এত টাকা আমি লোকসান করতে পারব না। তা ছাড়া বিষয় আমার ভাইয়ের। আমি অভিভাবক মাত্র।

রমেশ। না, আমি জানি অর্ধেক তোমার।

রমা। শুধু নামে, বাবা নিশ্চয় জানতেন সমস্ত বিষয় যতীনই পাবে। তাই অর্ধেক আমার নামে দিয়ে গেছেন।

রমেশ। (মিনতির কণ্ঠে) রমা, এ ক'টা টাকা? এদিকে তোমাদের অবস্থা সকলের চেয়ে ভাল। তোমার কাছে এ ক্ষতি ক্ষতিই নয়। আমি মিনতি জানাচ্চি, এর জন্যে এত লোককে অন্নহীন কোরো না। যথার্থ বলচি, তুমি যে এত নিষ্ঠুর হতে পার আমি স্বপ্নেও ভাবিনি।

রমা। নিজের ক্ষতি করতে পারিনে বলে যদি নিষ্ঠুর হই, না হয় তাই। ভাল, আপনার যদি এতই দয়া, নিজেই না হয় ক্ষতিপূরণ করে দিন না।

রমেশ। রমা, মানুষ খাঁটি কি না চেনা যায় শুধু টাকার সম্পর্কে। এই জায়গাটায় নাকি ফাঁকি চলে না, তাই এইখানেই মানুষের যথার্থ রূপ ধরা পড়ে। তোমারও আজ তাই

পড়েচে। কিন্তু তোমাকে আমি কখনো এমন করে ভাবিনি। ভেবেচি, তুমি এর চেয়ে অনেক, অনেক ওপরে। কিন্তু তুমি তা নও। তোমাকে নিষ্ঠুর বলাও ভুল। তুমি অতি নীচ, অতি ছোটো।

রমা। কি আমি? কি বললেন?

রমেশ। তুমি অত্যন্ত হীন এবং নীচ। আমি যে কত ব্যাকুল হয়ে উঠেচি, সে তুমি টের পেয়েছ বলেই আমার কাছে দুঃখীর মুখের গ্রাসের দাম আদায়ের দাবী করলে। কিন্তু বড়দাও মুখ ফুটে এ কথা বলতে পারেন নি। পুরুষ হয়েও তাঁর মুখে যা বেধেছে, নারী হয়ে তোমার মুখে তা বাধেনি।—একটা কথা তোমাকে আজ বলে যাই রমা। আমি এর চেয়েও ঢের বেশি ক্ষতিপূরণ করতে পারি, কিন্তু সংসারে যত পাপ আছে, মানুষের দয়ার ওপর জুলুম করাটাই সবচেয়ে বড়। আজ তুমি তাই করে আমার কাছে টাকা আদায়ের ফন্দি করেচ।

[রমা বিহ্বল হতবুদ্ধির ন্যায় নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল]

রমেশ। আমার দুর্বলতা কোথায় সে তোমাদের অগোচর নেই বটে, কিন্তু সেখানে পাক দিয়ে আজ একবিন্দু রস পাবে না। কিন্তু কি আমি করব তাও তোমাকে জানিয়ে দিয়ে যাই। এখুনি গিয়ে নিজে জোর করে বাঁধ কাটিয়ে দেব,—তোমরা পার আটকাবার চেষ্টা করো গে।

[এই বলিয়া রমেশ চলিয়া যাইতেছিল, রমা ফিরিয়া ডাকিল]

রমা। শুনুন। আমার বাড়িতে দাঁড়িয়ে আমাকে যত অপমান করলেন, আমি তার একটারও জবাব দেব না। কিন্তু এ কাজ আপনি কিছুতেই করবার চেষ্টা করবেন না।

রমেশ। কেন?

রমা। কারণ, এত অপমানের পরেও আমার আপনার সঙ্গে বিবাদ করতে ইচ্ছে করে না। আর–

রমেশ। আর কি?

রমা। আর, আর–হয়ত, আকবর-সর্দারের দল এসে পড়েচে।

রমেশ। কারা তোমার আকবর-সর্দারের দল আমি জানিনে–জানতেও চাইনে। কলহ-বিবাদের অভিরুচি আমারও নেই, কিন্তু, তোমার সদ্ভাবের মূল্যও আর আমার কাছে কিছুমাত্র নেই।

[দ্রুতপদে প্রস্থান]

[মাসীর প্রবেশ]

মাসী। কে অমন কোরে হাঁকাহাঁকি করছিল রে রমা, যেন চেনা-গলা?

রমা। কেউ না।

মাসী। না বললেই শুনব? সন্ধ্যেটি দিয়ে আহ্নিক করতে বসেচি, যেন ষাঁড়-চেঁচানো চেঁচাচ্ছে। আহ্নিক ফেলে রেখে উঠে আসতে হোল।

রমা। সে চলে গেছে। তুমি ফিরে গিয়ে আবার আহ্নিকে বসো গে। কুমুদা!

[দাসীর প্রবেশ]

কুমুদা। কেন দিদি?

রমা। একবার জ্যাঠাইমার ওখানে যাব, আমার সঙ্গে চলো।

মাসী। সেখানে আবার কিসের জন্যে?

রমা। দেখ মাসি, সব কথাই তোমাকে জানতে হবে তার মানে নেই। চল্ কুমুদা।

কুমুদা। চল দিদি।

[উভয়ের প্রস্থান]

মাসী। বাপ্‌রে! যেন মারমুখী! তবু যদি না লোকে তারকেশ্বরের কথা শুনত! আমি তাই লোকের সঙ্গে ঝগড়া করে মরি!

[প্রস্থান]

[বেণী, গোবিন্দ, আহত আকবর ও তাহার
দুই পুত্র গহর ও ওস্‌মানের প্রবেশ]

আকবর। (খুঁটি ঠেস দিয়া বসিয়া পড়িল। তাহার সমস্ত মুখ রক্তে ভাসিতেছে) আল্লা!

গহর। (নিজের রক্তধারা হাত দিয়া মুছিয়া ফেলিয়া) বাপজান্, দরদ কি বেশি মালুম হচ্চে?

আকবর। আল্লা!

বেণী। কথা শোন্ আকবর। থানায় চল্। সাত বছর যদি না তাকে দিতে পারি ত ঘোষাল-বংশের ছেলে নই আমি।

[রমার প্রবেশ]

রমা। অ্যাঁ! এমনধারা কে করলে তোমাদের আকবর?(এই বলিয়া সে অদূরে বসিয়া পড়িল)

আকবর। (আকাশের প্রতি হাত তুলিয়া) আল্লা!

বেণী। আল্লা! আল্লা! এখানে বসে আল্লা আল্লা করলে হবে কি? বলচি থানায় চল্। যদি না এর শোধ দশ বচ্ছর ঠেলতে পারি ত,—রমা, তুমি চুপ করে রইলে কেন? বল না একবার থানায় যেতে।

রমা। কে তোমাকে এমন কোরে জখম করলে আকবর?

আকবর। ছোটবাবু দিদিঠাকরুন।

রমা। এ কি কখনো হতে পারে আকবর? ছোটবাবু একলা তোমাদের তিন বাপ-ব্যাটাকে জখম কোরে দিলে? এ যে তিনশো জনে পারে না!

আকবর। তাই ত হোলো দিদিঠাকরান! সাবাস! মায়ের দুধ খেয়েছিল বটে! লাঠি ধরলে বটে!

গোবিন্দ। সেই কথাই ত থানায় গিয়ে বলতে বলচি রে ব্যাটা! কার লাঠিতে তুই জখম হলি? ছোটবাবুর, না সেই হারামজাদা ভোজোর?

আকবর। সেই বেঁটে হিন্দুস্থানীটার? লাঠির সে জানে কি? কি বলিস রে গহর, তোর পয়লা চোটেই সে বসেছিল, না রে?

[গহর কথা কহিল না, মাথা নাড়িয়া সায় দিল]

আকবর। মোর হাতের চোট পেলে সে বাঁচত না। গহরের লাঠিতেই বাপ কোরে সে বসে পড়লে দিদিঠাকরান।

আকবর। তখন ছোটবাবু তার লাঠি তুলে নিয়ে বাঁধ এট্‌কে দাঁড়াল দিদিঠাকরান, তিন বাপ-ব্যাটায় মোরা হটাতে নারলাম। আঁধারে বাঘের মত তেনার চোখ জ্বলতে লাগল। কইলেন, আকবর, বুড়োমানুষ তুই সরে যা। বাঁধ কেটে না দিলে সারা গাঁয়ের লোক মারা পড়বে, তাই কেট্‌তেই হবে। তুইও ত রে চাষী, তোর আপন গাঁয়েও ত জমিজমা আছে, সমঝে দেখ্‌ রে, সব বরবাদ হয়ে গেলে তোর ক্যামন লাগে? মুই সেলাম কোরে কইলাম, আল্লার কিরে ছোটবাবু, তুমি একটিবার পথ ছাড়। দিদিঠাকরান পেঠিয়েছে মোদের, মোরা জান কবুল দিইচি। তিনি চমকে উঠে কইলেন, তোদের রমা পাঠিয়েছে আকবর, আমারে মারতে? মুই কইলাম, তবে বাঁধ এট্‌কো না ছোটবাবু, ঘরকে যাও। তোমার আড়ালে দেঁড়িয়ে ঐ যে কয় সুম্মুন্দি মুয়ে কাপড় জড়ায়ে ঝপাঝপ্‌ কোদাল মারচে ওদের শিরগুলো ফাঁক কোরে দিয়ে যাই।

বেণী। বেইমান ব্যাটারা,—তাকে সেলাম বাজিয়ে এসে এখানে চালাকি মারা হচ্চে।

আকবর। (তিন বাপ-ব্যাটায় প্রতিবাদের ভঙ্গীতে হাত তুলিয়া) খবরদার বড়বাবু! বেইমান কোয়ো না। মোরা মোছলমানের ছ্যালে সব সইতে পারি,—ও পারি না।—(হাত দিয়া কতকটা রক্ত মুছিয়া ফেলিয়া) অ্যারে বেইমান কয় দিদি? ঘরের মধ্যি বসি বেইমান কইচো বড়বাবু, চোখে দ্যেখলি জানতে পারতে ছোটবাবু কি!

বেণী। (মুখ বিকৃত করিয়া) ছোটবাবু কি! তাই থানায় গিয়ে জানিয়ে আয় না? বলবি, তোরা বাঁধ পাহারা দিচ্ছিলি, ছোটবাবু চড়াও হয়ে তোদের মেরেচে।

আকবর। (জিভ কাটিয়া) তোবা! তোবা! দিনকে রাত করতি বল বড়বাবু?

বেণী। না হয় আর কিছু বলবি। আজ রাত্তিরে গিয়ে জখম দেখিয়ে আয় না,—কাল ওয়ারেন্ট বার কোরে একেবারে হাজতে পুরবো। রমা, তুমি ভাল কোরে একবার বুঝিয়ে বল না? এমন সুবিধা যে আর কখনো পাওয়া যাবে না!

[রমা নীরবে একবার আকবরের মুখের প্রতি চাহিল]

আকবর।(মাথা নাড়িয়া) না দিদিঠাকরান, ও পারব না।

বেণী।(ধমক দিয়া) পারবি নে কেন শুনি?

আকবর।(ক্রুদ্ধকণ্ঠে) কি কও বড়বাবু, সরম নেই মোর? পাঁচখানা গাঁয়ের লোকে মোরে সর্দার কয় না? দিদিঠাকরান, তুমি হুকুম দিলে আসামী হয়ে জ্যাল যাতি পারি, ফৈরিদি হব কোন্ কালামুয়ে?

রমা। সত্যিই পারবে না আকবর?

আকবর। না, দিদিঠাকরান, আর সব পারি, সদরে গিয়ে গায়ের চোট দেখাতে না পারি। ওঠ্ রে গহর, এইবার ঘরকে যাই। মোরা নালিশ করতি পারব না।

[এই বলিয়া তাহারা উঠিয়া দাঁড়াইল ও চলিয়া যাইতে লাগিল]

গোবিন্দ। সত্যিই যে চলে যায় বড়বাবু? কিছুই যে হোলো না?

বেণী ! বারণ কর না রমা, এমন সুযোগ ফসকালে যে আর কখনো মিলবে না।

[রমা অধোমুখে নির্বাক হইয়া রহিল; আকবর ও তাহার
দুই পুত্র লাঠিতে ভর দিয়া কোনমতে বাহির হইয়া গেল]

বেণী। ও–বোঝা গেছে সমস্ত।

গোবিন্দ। হুঁ, যা শোনা গেল তা মিথ্যে নয় দেখচি।

[উভয়ের দ্রুতপদে প্রস্থান]

রমা। রমেশদা, এ যে তুমি পারো, এত শক্তি যে তোমার ছিল এ কথা ত আমি স্বপ্নেও ভাবিনি!

পঞ্চম দৃশ্য

[গ্রামের একাংশ। কয়েকটা ভাঙ্গা মন্দিরের কিছু-কিছু দেখা যাইতেছে। বৃক্ষ-লতা-গুল্মে সমস্ত স্থান সমাকীর্ণ। মনে হয় এদিকে কদাচিৎ কখনো কেহ আসে মাত্র]

[বেণী ও গোবিন্দর প্রবেশ]

গোবিন্দ। (সচকিতে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া) কে জানে কোন্ শালা আবার কোথা দিয়ে শুনবে। যে জাল বিস্তার করে দড়িটি ধরে বসে আছি বাবা, একটুখানি টান দিয়েচি অমনি ঝুপ করে পড়েচে।

বেণী। কাজ হাঁসিল ত?

গোবিন্দ। নইলে কি আর তোমাকে এই বনের মধ্যে নাহক ডেকে এনেচি বাবা! তুই শালা ভৈরব আচায্যি,—তোর নেই এক কড়ার মুরোদ, তুই যাস আমাদের বিপক্ষে? তুই যাস পরকে আগলাতে? এখন বাস্তুভিটেটা বাঁচা! কি করে মেয়ের বিয়ে দিস তা একবার দেখি!

বেণী। ডিক্রি হয়েছে তাহলে?

গোবিন্দ। (দুই হাতের দশ আঙুল তুলিয়া ধরিয়া) একটি হাজার! কিন্তু শুধু কথায় চিঁড়ে ভিজবে না বাবা, আধাআধি।

বেণী। (অত্যন্ত খুশী হইয়া) আধাআধি কেন খুড়ো, দশ-আনা ছ'-আনা।

গোবিন্দ। ভ্যালা মোর বাপ্ রে! শুধু এই নয় বাবা। সুমুখে পূজো। যদু মুখুয্যের কন্যা এবার মাকে কি করে আনেন তা দেখতে হবে। আসচে ফাগুনে ঘটা করে ভাইয়ের পৈতেটি কি করে দেন তাও একবার নেড়ে-চেড়ে পাঁচজনকে দেখাব,—তবে আমার নাম গোবিন্দ গাঙ্গুলী।

বেণী। তারকেশ্বরের কাণ্ডটা তা হলে সত্যি বল?

গোবিন্দ। সত্যি নয়? শালা নটবর কি কিছু বলতে চায়? বকশিশ কোবলে, পিঠে হাত বুলিয়ে কিছুতেই কিছু হয় না। ব্যাটা আর ভাঙ্গে না। তখন ফস করে পায়ের ধুলো মাথায় দিয়ে বললাম, বাবা, রমার চাকরই হও আর যাই হও,—শুদ্দুর ছাড়া আর কিছু নও, ছেলেপুলে নিয়ে ঘর কর, বামুনের পায়ের ধূলো মাথায় করে যদি মিথ্যে বল, তে-রাত্তির পোয়াবে না, সর্পাঘাত হবে। ব্যাটা যেন কাঁদো-কাঁদো হয়ে গেল। সাহস দিয়ে বললাম, নটবর, চাকরি গেলে আবার ঢের হবে, কিন্তু প্রাণ গেলে আর হবে না। তখন ফড়্ফড়্ করে আগাগোড়া ব্যাপারটা বলে ফেললে।—ঠাকরুনের ছ'টার গাড়িতে আর বাড়ি আসা হলো না। বাবু রাত্তিরে বাসায় রইলেন, খাওয়া-দাওয়া, হাসি-গল্প—যাক, পরচর্চায় কাজ নেই—ঘটনাটা সত্যি।

বেণী। দেখলে না খুড়ো, কিছুতেই আকবরকে থানায় যেতে দিলে না!

গোবিন্দ। দেবে কি করে? দেওয়া কি যায় বাবা? যায় না।

বেণী। হুঁ। অন্ধকার হয়ে আসচে, যাওয়া যাক চল।

গোবিন্দ। চল। (হঠাৎ বেণীর হাতটা ধরিয়া ফেলিয়া) কিন্তু বাবা, ভাইপোটা যে অর্ধেক বিষয় টেনে নেবে তা চলবে না বলে রাখচি। সামলাতে হবে।

বেণী। নির্ভয়ে থাকো খুড়ো, আমি বেঁচে থাকতে তা হবে না।

গোবিন্দ। হাটের অংশটা এবার ছেড়ে দিতে রমা পথ পাবে না তাও তোমাকে বলে রাখলাম বড়বাবু। কিন্তু চেপে। ব্যাপারটা হঠাৎ চাউর করে ফেলো না।

বেণী। (ঈষৎ হাসিয়া) দেখা যাক।

[উভয়ের প্রস্থান]

ষষ্ঠ দৃশ্য

[রমেশের বাটীর অন্তঃপুর। তাহার শয়নকক্ষে বসিয়া রমেশ গভীর রাত্রি পর্যন্ত লেখাপড়া করিতেছিল। অকস্মাৎ নেপথ্যে কাহার ক্রন্দনের শব্দ শুনা গেল, এবং পরক্ষণে ভৈরব আচার্য গোপাল সরকারের গলা জড়াইয়া মড়াকান্না কাঁদিতে কাঁদিতে প্রবেশ করিল। রমেশ ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল]

ভৈরব। (সরোদনে) বাবু, আমি ধনেপ্রাণে মারা গেছি।

রমেশ। ব্যাপার কি সরকারমশাই?

গোপাল সরকার। কাজ সেরে শুতে যাচ্ছিলেম বাবু, হঠাৎ কোথা থেকে ছুটে এসে আচায্যিমশাই গলা জড়িয়ে ধরেছে। গলাও ছাড়ে না, কান্নাও থামায় না।

রমেশ। কি হলো আচায্যিমশাই?

ভৈরব। বাবু গো, আমি এক্কেবারে গেছি! ছেলেপুলের হাত ধরে এবার গাছতলায় শুতে হবে।

রমেশ। গাছতলায় কেন? ঘর কি হলো?

ভৈরব। আর নেই,—নিলেম করে নিয়েচে।

রমেশ। এই ত সকালেও ছিল। এরই মধ্যে কে নিলেম করে নিলে?

ভৈরব। কে এক সনৎ মুখুয্যে বাবু, গোবিন্দ গাঙ্গুলীর খুড়শ্বশুর। (ক্রন্দন)

গোপাল। আরে, আমার গলা ছাড়ুন না। বাবুকে সমস্ত বুঝিয়ে বলুন,—কে নিলে, কেন নিলে, খামোকা আমাকে জড়িয়ে ধরে থাকলে কি হবে? ছাড়ুন।

ভৈরব। (গলা ছাড়িয়া) এক হাজার সাতাশ টাকা পাঁচ আনা ছ' পাই,—বাবু গো, ধনেপ্রাণে গেলাম।

গোপাল। টাকা কর্জ নিয়েছিলেন?

ভৈরব। না, এক পয়সা না সরকারমশাই। দেনা মিথ্যে, খত মিথ্যে—কবে নালিশ হলো, কবে সমন হলো, কবে ডিক্রি হয়ে বাড়ি-ঘরদোর নিলাম হয়ে গেল—কিছুই জানিনে বাবু। কাল কানাঘুষো খবর পেয়ে সদরে গিয়ে টের পেলাম—ছেলেপুলে নিয়ে আমাকে গাছতলায় শুতে হবে। এক হাজার সাতাশ টাকা পাঁচ আনা ছ' পাই—

রমেশ। এমন ভয়ানক কথা ত কখনো শুনিনি সরকারমশাই?

গোপাল। পাড়াগাঁয়ে এমন অনেক হয় বাবু। যারা গরীব, বড়লোকের কোপে পড়ে তারা সত্যিই ধনেপ্রাণে মারা যায়, এ সমস্তই বেণীবাবু আর গাঙ্গুলীমশায়ের কাজ—আচায্যিমশাই বরাবর আমাদের দিকে আছেন বলেই তাঁর এই বিপদ।

ভৈরব। হাঁ বাবু, তাই। তাই আমার এই বিপদ।

রমেশ। কিন্তু এর উপায় সরকারমশাই?

গোপাল। অনেক টাকার ব্যাপার। এ ঋণ মিথ্যে, দলিল মিথ্যে, সাক্ষী মিথ্যে,—কে হয়ত ওঁর নাম লিখে সমন নিয়েচে, কে হয়ত আদালতে গিয়ে কবুল জবাব দিয়েচে, সদরে গিয়ে সমস্ত তদন্ত না করে ত কিছুই বলবার জো নেই।

রমেশ। তাই আপনি যান। সমস্ত খবর নিয়ে যত টাকা লাগে এর প্রতিকার করুন। এমন করুন যেন এতবড় অত্যাচার করতে আর কেউ না সাহস করে।

ভৈরব। (অকস্মাৎ রমেশের পা জড়াইয়া ধরিয়া) বাবু গো, আপনি চিরজীবী হোন। ধনেপুত্রে লক্ষ্মীলাভ করে আপনি রাজা হোন। ভগবান আপনাকে যেন–

রমেশ। (পা ছাড়াইয়া লইয়া) আপনি বাড়ি যান আচায্যিমশাই, যা করা উচিত আমি করব।

ভৈরব। ভগবান যেন আপনাকে—

রমেশ। রাত অনেক হলো আচায্যিমশাই, আজ আমি বড় শ্রান্ত।

ভৈরব। ভগবান যেন আপনাকে দীর্ঘজীবী করেন, ভগবান যেন আপনাকে রাজা করেন—

[ইত্যাদি বলিতে বলিতে ভৈরবের প্রস্থান]

রমেশ। (দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া) সরকারমশাই, এই আমাদের গর্বের ধন। এই আমাদের শুদ্ধশান্ত ন্যায়নিষ্ঠ বাঙলার পল্লীসমাজ।

গোপাল। হাঁ, এই। সবাই জানবে এ কাজ বেণীবাবুর, সবাই গোপনে জল্পনা করে বেড়াবে, কিন্তু মুখ ফুটে কেউ এ অত্যাচারের প্রতিবাদ করবে না। সেবার গাঙ্গুলীমশাই বিধবা বড়ভাজকে মেরে বাড়ি থেকে বার করে দিলে, কিন্তু বেণীবাবু সহায় বলে সবাই চুপ করে রইল। সে কেঁদে সকলকে জানালে, সকলেই বললে, আমরা কি কোরব। ভগবানকে জানাও তিনিই এর বিচার করবেন।

রমেশ। তার পরে?

গোপাল। তার পরে সেই গাঙ্গুলীমশাই-ই সকলের জাত মেরে বেড়াচ্চেন। মৃত পল্লীসমাজ কথাটি বলবার সাহস রাখে না। অথচ, আমিই ছেলেবেলায় দেখেচি বাবু, এমন ধারা ছিল না। বিধবা বড়ভাজের গায়ে হাত দিয়ে কেউ সহজে নিস্তার পেত না। তখন সমাজ দণ্ড দিত, এবং সে দণ্ড অপরাধীকে মাথা পেতে নিতে হতো।

রমেশ। তবে কি পল্লীসমাজ বলে কিছুই আর নেই?

গোপাল। যা আছে সে ত এসে পর্যন্ত স্বচক্ষেই দেখচেন। যা আর্তকে রক্ষে করে না, দুঃখীকে শুধু দুঃখের পথেই ঠেলে দেয়, তাকেই সমাজ বলে কল্পনা করার মহাপাপ। আমাদের নিয়ত রসাতলের দিকেই টেনে নিয়ে যাচ্চে।

রমেশ। (আশ্চর্য হইয়া) সরকারমশাই, এ-সকল কথা আপনি জানলেন কার কাছে?

গোপাল। আমার স্বর্গীয় মনিবের কাছে। এইমাত্র যে ভৈরবকে উদ্ধার করতে চাইলেন, এ শক্তি আপনি পেলেন কোথায়? এ তাঁরই দয়া। এমনি কোরে বিপন্নকে উদ্ধার করতে তাঁকে যে আমি বহুবার দেখেচি ছোটবাবু।

রমেশ। (দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া) বাবা–

গোপাল। রাত প্রায় শেষ হয়ে এল বাবু, আপনি একটু শোন।

রমেশ। হাঁ শুই। আপনি বাড়ি যান সরকারমশাই।

[গোপাল সরকার প্রস্থান করিলেন। রমেশ শয়নের আয়োজন করিতেছিল, সহসা দ্বারের কাছে কি একটা দেখিতে পাইয়া চমকিয়া প্রশ্ন করিল–]

রমেশ। কে? কে দাঁড়িয়ে?

[যতীন দ্বারের কাছে মুখ বাড়াইয়া]

যতীন। ছোড়দা, আমি।

রমেশ। (কাছে গিয়া) যতীন? এত রাত্রে? আমায় ডাকচ?

যতীন। হাঁ, আপনাকে।

রমেশ। আমাকে ছোড়দা বলতে তোমাকে কে বলে দিলে?

যতীন। দিদি।

রমেশ। রমা! তিনি কি তোমাকে কিছু বলতে পাঠিয়েছেন?

যতীন। না। দিদি বললেন, আমাকে সঙ্গে কোরে তোর ছোড়দার বাড়িতে নিয়ে চল্। ঐ যে ওখানে দাঁড়িয়ে আছেন।

[এই বলিয়া সে দরজার বাহিরে চাহিল]

রমেশ। (ব্যস্ত হইয়া সরিয়া আসিয়া) আজ আমার একি সৌভাগ্য! কিন্তু আমাকে ডেকে না পাঠিয়ে এত রাত্রে নিজে এলে কেন? এস, ঘরে এস।

[রমা অত্যন্ত দ্বিধাভরে ভিতরে প্রবেশ করিয়া দ্বারের অনতিদূরে মেঝের উপর বসিয়া পড়িল। যতীন দিদির কাছে আসিয়া বসিতে যাইতেছিল, কিন্তু রমেশ তাহাকে একটি আরাম-কেদারায় আনিয়া শোয়াইয়া দিল]

রমা। রাত আর নেই, ভোর হয়ে এসেছে, (অধোমুখে) শুধু একটি জিনিস আপনার কাছে ভিক্ষে চেয়ে নেবো বলে আপনার বাড়িতে এসেচি। দেবেন বলুন?

রমেশ। আমার কাছে ভিক্ষে চাইতে? আশ্চর্য! কি চাই বল?

রমা। (মুখ তুলিয়া ক্ষণকাল অপলক-চক্ষে রমেশের মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল) আগে কথা দিন।

রমেশ। (মাথা নাড়িয়া) তা পারিনে। তোমাকে কোন প্রশ্ন না করেই কথা দেবার শক্তি যে তুমি নিজের হাতেই ভেঙ্গে দিয়েচ রমা।

রমা। আমি ভেঙ্গে দিয়েচি?

রমেশ। তুমিই। তুমি ছাড়া এ শক্তি সংসারে আর কারু ছিল না। রমা, আজ তোমাকে একটা সত্যি কথা বলব।—ইচ্ছে হয় বিশ্বাস কোরো, ইচ্ছে না হয় কোরো না। কিন্তু জিনিসটা যদি না মরে একেবারে নিঃশেষ হয়ে যেতো, হয়ত এ কথা তোমাকে কোনদিন শোনাতে পারতাম না। কিন্তু আজ নাকি আর কোন পক্ষেই লেশমাত্র ক্ষতির সম্ভাবনা নেই, তাই আজ জানাচ্চি, সেদিন পর্যন্তও তোমাকে অদেয় আমার কিছুই ছিল না। কিন্তু কেন জানো?

রমা। (মাথা নাড়িয়া জানাইল) না।

রমেশ। কিন্তু শুনে রাগ কোরো না। লজ্জাও পেয়ো না। মনে করো এ কোন পুরাকালের একটা গল্প শুনচ মাত্র। তোমাকে ভালবাসতাম রমা। মনে হয়, তেমন ভালবাসা বোধ হয় কেউ কখনো বাসেনি। ছেলেবেলায় মা'র মুখে শুনেছিলাম আমাদের বিয়ে হবে। তারপরে, যেদিন সমস্ত ভেঙ্গে গেল, সেদিন—কত বছর কেটে গেল, তবু মনে হয় সে বুঝি কালকের কথা।

[রমা তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া পলকের জন্য শিহরিয়া
আবার স্তব্ধ অধোমুখে নিশ্চল হইয়া রহিল]

রমেশ। তুমি ভাবছ তোমাকে এ-সব কাহিনী শোনানো অন্যায়। আমার মনেও এ সন্দেহ ছিল বোলেই সেদিন তারকেশ্বরে যখন একটি দিনের সমাদরে আমার সমস্ত জীবনের ধারা বদলে দিয়ে গেলে, সেদিনও চুপ করেই ছিলাম। চুপ করেই ছিলাম, কিন্তু সে নীরবতার ব্যথা মাপবার মানদণ্ড হয়ত শুধু অন্তর্যামীর হাতেই আছে।

রমা। (কিছুতেই যেন আর সহিতে পারিল না) যা তাঁর হাতে আছে তা তাঁর হাতেই থাক না রমেশদা।

রমেশ। তাই ত আছে রমা।

রমা। তবে—তবে, আজকেই বা বাড়িতে পেয়ে আমাকে অপমান করচেন কেন?

রমেশ। অপমান! কিছুমাত্র না। এর মধ্যে মান-অপমানের কথাই নেই। এ যাদের কাহিনী শুনচো, সে রমাও তুমি কোনদিন ছিলে না, সে রমেশও আর আমি নেই।

রমা। রমেশদা, আপনার নিজের কথাই বলুন। রমার কথা আমি আপনার চেয়ে বেশী জানি।

রমেশ। যাই হোক শোন। কেন জানিনে, সেদিন আমার অসংশয়ে বিশ্বাস হয়েছিল, তুমি যা ইচ্ছে বল, যা খুশি কর, কিন্তু আমার সত্যিকার অকল্যাণ তুমি কিছুতে সইতে পারবে না। বোধ করি ভেবেছিলাম, সেই যে ছেলেবেলায় একদিন ভালবেসেছিলে, সেই যে হাতে কোরে চোখ মুছিয়ে দিয়েছিলে, হয়ত তা আজও একেবারে ভুলতে পারনি। তাই মনে করেছিলাম কোন কথা তোমাকে না জানিয়ে তোমারি ছাওয়ায় বসে সমস্ত জীবনের

কাজগুলো আমার ধীরে ধীরে কোরে যাব। কিন্তু সে রাত্রে আকবরের নিজের মুখে যখন শুনতে পেলাম তুমি নিজে—ও কি? বাইরে এত গোলমাল কিসের?

[দ্রুতবেগে গোপাল সরকারের প্রবেশ]

গোপাল। ছোটবাবু! (অকস্মাৎ রমাকে দেখিয়া স্তব্ধ হইয়া থামিল)

রমেশ। কি হয়েচে সরকারমশাই?

গোপাল। পুলিশের লোক ভজুয়াকে গ্রেপ্তার করেচে।

রমেশ। ভজুয়াকে? কেন?

গোপাল। সেদিন রাধাপুরের ডাকাতিতে সে নাকি ছিল।

রমেশ। আচ্ছা, আমি যাচ্চি। আপনি বাইরে যান।

[গোপাল সরকার প্রস্থান করিল]

রমেশ। যতীন ঘুমিয়ে পড়েচে, সে থাক। কিন্তু তুমি আর একমুহূর্ত থেকো না রমা, খিড়কি দিয়ে বেরিয়ে যাও। পুলিশ খানাতল্লাশি করতে ছাড়বে না।

রমা। (উঠিয়া দাঁড়াইয়া ভীতকণ্ঠে) তোমার নিজের ত কোন ভয় নেই?

রমেশ। বলতে পারিনে রমা। কতদূর কি দাঁড়িয়েচে সে ত এখনো জানিনে।

রমা। তোমাকেও ত গ্রেপ্তার করতে পারে?

রমেশ। তা পারে।

রমা। পীড়ন করতেও ত পারে?

রমেশ। অসম্ভব নয়।

রমা। (সহসা কাঁদিয়া উঠিয়া) আমি যাব না রমেশদা।

রমেশ। (সভয়ে) যাবে না কি-রকম?

রমা। তোমাকে অপমান করবে, তোমাকে পীড়ন করবে—আমি কিছুতেই যাব না রমেশদা।

রমেশ। (ব্যাকুল-কণ্ঠে) ছি ছি, এখানে থাকতে নেই। তুমি কি পাগল হয়ে গেলে রানী!

[এই বলিয়া দুই হাত ধরিয়া জোর করিয়া তাহাকে বাহির করিয়া দিল।
ওদিকে বহু লোকের পদশব্দ ও গোলমাল স্পষ্টতর হইয়া উঠিতে লাগিল]

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বিশ্বেশ্বরীর গৃহ। জ্যাঠাইমা ও রমেশ

জ্যাঠাইমা। হাঁরে রমেশ, তুই নাকি তোর পীরপুরের নতুন ইস্কুল নিয়েই মেতে রয়েছিস, আমাদের ইস্কুলে আর পড়াতে যাসনে?

রমেশ। না। যেখানে পরিশ্রম শুধু পণ্ডশ্রম, যেখানে কেউ কারো ভালো দেখতে পারে না, সেখানে খেটে মরায় কোন লাভ নেই। শুধু মাঝে থেকে নিজেরই শত্রু বেড়ে ওঠে। বরঞ্চ, যাদের মঙ্গলের চেষ্টায় দেশের সত্যকার মঙ্গল হবে, সেই-সব মুসলমান আর হিন্দুর ছোটজাতেদের মধ্যেই পরিশ্রম করব।

জ্যাঠাইমা। এ কথা ত নতুন নয় রমেশ। পৃথিবীতে ভাল করবার ভার যে-কেউ নিজের ওপরে নিয়েচে চিরদিনই তার শত্রুসংখ্যা বেড়ে উঠেচে। সেই ভয়ে যারা পেছিয়ে দাঁড়ায়, তুইও যদি তাদেরি দলে গিয়ে মিশিস তা হলে ত চলবে না বাবা। এ গুরুভার ভগবান তোকেই বইতে দিয়েচেন, তোকেই বয়ে বেড়াতে হবে। কিন্তু হ্যাঁরে, তুই নাকি ওদের হাতে জল খাস?

রমেশ। (হাসিয়া) এই দেখ, এরই মধ্যে তোমার কানে উঠেচে। কিন্তু আমি ত তোমাদের জাতভেদ মানিনে জ্যাঠাইমা।

জ্যাঠাইমা। মানিস নে কি রে? এ কি মিছে কথা, না, জাতভেদ নেই যে তুই মানবি নে?

রমেশ। আছে তা মানি, কিন্তু ভাল বলে মানিনে। এর থেকে কত মনোমালিন্য, কত হানাহানি—মানুষকে ছোট করে অপমান করবার ফল কি তুমি দেখতে পাও না জ্যাঠাইমা? সেদিন অর্থাভাবে দ্বারিক ঠাকুরের প্রায়শ্চিত্ত হয়নি বলে তার মৃতদেহ কেউ স্পর্শ করতে চায়নি, এ কথা কি তুমি জানো না?

জ্যাঠাইমা। জানি বাবা, সব জানি। কিন্তু এর আসল কারণ জাতিভেদ নয়। যা সবচেয়ে বড় কারণ তা এই যে, যাকে যথার্থ ধর্ম বলে, একদিন যা এখানে ছিল, আজ তা পল্লীগ্রাম থেকে একেবারে লোপ পেয়েচে। আছে শুধু কতকগুলো অর্থহীন আচারের কুসংস্কার, আর তার থেকে নিরর্থক দলাদলি।

রমেশ। এর কি কোন প্রতিকার নেই জ্যাঠাইমা?

জ্যাঠাইমা। আছে বৈ কি বাবা। প্রতিকার আছে শুধু জ্ঞানে। যে পথে তুই পা দিয়েচিস শুধু সেই পথে। তাই ত তোকে বার বার বলি বাবা, তুই যেন তোর জন্মভূমিকে ত্যাগ করে কিছুতে যাসনে। তোর মত বাইরে থেকে যারা বড় হতে পেরেচে, তারা যদি তোরই মত গ্রামে ফিরে আসত, সমস্ত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করে চলে না যেত, পল্লীগ্রামের এতবড় দুর্গতি হোত না। তারা কখনো গোবিন্দকে মাথায় নিয়ে তোরে দূরে সরাতো না।

রমেশ। দূরে যেতে আর আমার দুঃখ নেই জ্যাঠাইমা।

জ্যাঠাইমা। কিন্তু এই দুঃখই যে সবচেয়ে বড় দুঃখ রমেশ। কিন্তু আজ যদি কাজের মাঝখানেই সব ছেড়ে দিয়ে চলে যাস বাবা, তোর জন্মভূমি তোকে ক্ষমা করবে না।

রমেশ। জন্মভূমি ত শুধু একা আমার নয় জ্যাঠাইমা!

জ্যাঠাইমা। তোর একার বৈ কি বাবা, শুধু তোরই মা। দেখতে পাসনে মা মুখ ফুটে সন্তানের কাছে কোনদিন কিছুই দাবী করেন না। তাই এত লোক থাকতে কারো কানেই তাঁর কান্না গিয়ে পৌঁছয় নি, কিন্তু তুই আসামাত্রই শুনতে পেয়েচিস।

রমেশ। (ক্ষণকাল নতমুখে নীরবে থাকিয়া) একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করব জ্যাঠাইমা?

জ্যাঠাইমা। কি কথা রমেশ?

রমেশ। আমি ত তোমাদের জাতভেদ মানিনে, কিন্তু তুমি ত মানো?

জ্যাঠাইমা। তুই মানিস নে বলে আমি মানব না রে?

রমেশ। কিন্তু আমি ত সকলের ছোঁয়া খাই—আমার হাতে ত তুমি খেতে পারবে না জ্যাঠাইমা?

জ্যাঠাইমা। পারব না কিরে? তুই আমার বাবা—তাই কি ছোটখাটো? মস্ত বড় বাবা। মেয়ে হয়ে এতবড় আস্পর্ধার কথা কি আমি মুখে আনতে পারি রে?

রমেশ। (তৎক্ষণাৎ হেঁট হইয়া তাঁহার পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া) এই আশীর্বাদ আমাকে তুমি কর জ্যাঠাইমা, তোমাকে যেন আমি চিনতে পারি।

জ্যাঠাইমা। (তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া চুম্বন করিয়া) হয়েচে, হয়েচে। কিন্তু আমার যে এখনো আহ্নিক সারা হয়নি বাবা, একটুখানি বসবি?

রমেশ। না জ্যাঠাইমা, আমার ইস্কুলের বেলা হয়ে যাচ্ছে।

জ্যাঠাইমা। তালে যখনি সময় পাবি আসিস রমেশ।

[রমেশ ও জ্যাঠাইমার প্রস্থান]

[একদিক দিয়া রমা ও অপর দিক দিয়া দাসীর প্রবেশ]

রমা। জ্যাঠাইমা কোথায় রাধা?

দাসী। এইমাত্র পূজো করতে গেলেন। দেরি হবে না দিদি, একটু বসো না?

[বেণী প্রবেশ করিল, এবং তাহাকেই দেখিয়া দাসী সরিয়া গেল]

বেণী। তোমাকে আসতে দেখেই এলাম রমা। অনেক কথা আছে। মা বুঝি পূজো করতে গেলেন?

রমা। তাই ত রাধা বললে।

বেণী।অনেক চাল ভেবে কাজ করতে হয় দিদি, নইলে শত্রুকে জব্দ করা যায় না। সেদিন মনিবের হুকুমে যে ভজুয়া লাঠি-হাতে বাড়ি চড়াও হয়ে মাছ আদায় করতে এসেছিল সে কথা তুমি যদি না থানায় লিখিয়ে দিতে, আজ কি ব্যাটাকে এমন হাজতে পোরা যেত? অমনি ঐ সঙ্গে রমেশের নামটাও যদি দু'কথা বাড়িয়ে-গুছিয়ে লিখিয়ে দিতিস বোন! আমার কথাটায় তখন তোরা ত কেউ কান দিলিনে। না না না, তোমাকে সাক্ষী দিতে যেতে হবে না। আর তাই যদি হয়, তাতেই বা কি! জমিদারি রাখতে গেলে কিছুতে হটলে চলে না।—কিন্তু রমেশও কষ্ট দিতে আমাদের ছাড়বে না, দাদামশায়ের লাখো টাকা মেরেচে,—পীরপুরে খুলেচে ইস্কুল। এমনিই ত মুসলমান প্রজারা জমিদার বলে মানতে চায় না, তার উপর লেখাপড়া শিখলে জমিদারি রাখা না-রাখা আমাদের সমান হবে তা এখন থেকে বলে রাখচি।

রমা। আচ্ছা বড়দা, বিষয়-সম্পত্তি যদি নষ্ট হয়েই যায় তাতে রমেশদার নিজের ক্ষতিও কি কম?

বেণী। (ঈষৎ চিন্তা করিয়া) হুঁ। কি জানো রমা, এতে নিজের ক্ষতি ভাববার বিষয়ই নয়। আমরা দু'জনে জব্দ হলেই ও খুশী। দেখচ না, এসে পর্যন্ত কিরকম টাকা ছড়াচ্চে? ছোটলোকদের মধ্যে ' ছোটবাবু' 'ছোটবাবু' একটা সাড়া পড়ে গেছে। যেন ওই একটা মানুষ আর আমরা দু'ঘর কিছুই নয়। কিন্তু বেশী দিন এ চলবে না। এই যে তাকে পুলিসের নজরে তুমি খাড়া কোরে দিয়েচ বোন, এতেই তাকে শেষ হতে হবে।

রমা। আমি লিখিয়ে দিয়েছিলাম রমেশদা জানতে পেরেচেন?

বেণী। ঠিক জানিনে। কিন্তু জানতে পারবেই। ভজুয়ার মামলায় সব কথাই উঠবে কিনা।

রমা। (ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া) আচ্ছা বড়দা, আজকাল ওঁর নামই বুঝি সকলের মুখে মুখে?

বেণী। হুঁ। তা একরকম তাই বটে। কিন্তু আমিও অল্পে ছাড়ব না রমা। সে যে লেখাপড়া শিখিয়ে সমস্ত প্রজা বিগড়ে তুলবে, আর জমিদার হয়ে আমি মুখ বুজে সইব তা যেন কেউ স্বপ্নেও না ভাবে। এই ব্যাটা ভৈরব আচায্যি ভজুয়ার হয়ে সাক্ষী দিয়ে কি কোরে মেয়ের বিয়ে দেয়, তা একবার দেখতে হবে।

রমা। বল কি বড়দা?

বেণী। তা একবার নেড়েচেড়ে দেখতে হবে না? আমার বিপক্ষে আদালতে দাঁড়িয়ে কি কোরে ছেলেপুলে নিয়ে গাঁয়ে বাস করে তার খবর নিতে হবে না?—আর আচায্যি ত চুনো-পুঁটি; রুই-কাতলাও আছে। দেখি গোবিন্দখুড়ো কি বলে! দেশে ডাকাতি ত লেগেই

আছে, এবার চাকরকে যদি জেলে পুরতে পারি ত মনিবকে পুরতেও বেশী বেগ পেতে হবে না।

রমা। (অতি বিস্ময়ে তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া) বল কি বড়দা, রমেশদাকে দেবে তুমি জেলে?

বেণী। কেন, সে কি পীর প্যাগম্বর? বাগে পেলে তাকে ছাড়তে হবে নাকি? তুই বলিস কি?

রমা। (মৃদুকণ্ঠে) রমেশদা যদি জেলেই যান, সে কি আমাদেরই কলঙ্ক নয়?

বেণী। কেন? কেন শুনি?

রমা। আমাদেরই আত্মীয়, আমরা না বাঁচালে লোকে ত আমাদেরই ছি ছি করবে।

বেণী। যে যেমন কাজ করবে সে তার তেমন ফল ভুগবে। আমাদের কি?

রমা। রমেশদা ত সত্যিই আর চুরি-ডাকাতি কোরে বেড়ান না। বরঞ্চ পরের ভালোর জন্যেই নিজের সর্বস্ব দিচ্চেন সে কথা ত কারো কাছে চাপা নেই। তার পরে আমাদেরও ত গাঁয়ে মুখ দেখাতে হবে।

বেণী। তোর হলো কি বল ত বোন?

রমা। গাঁয়ের লোকে ভয়ে মুখের সামনে কিছু না বলুক আড়ালে বলবেই। তুমি বলবে আড়ালে রাজার মাকেও ডাইনি বলে। কিন্তু ভগবান ত আছেন? নিরপরাধীকে মিছে কোরে শাস্তি দেওয়ালে তিনি ত রেহাই দেবেন না!

বেণী। হা রে কপাল! সে ছোঁড়া বুঝি ঠাকুর-দেবতা কিছু মানে? শিবের মন্দিরটা ভেঙ্গে পড়চে—মেরামত করবার জন্যে তার কাছে লোক পাঠাতে সে হাঁকিয়ে দিয়ে বলেছিল, যারা তোমাদের পাঠিয়েচে তাদের বল গে বাজে খরচ করবার টাকা নেই আমার। শোন কথা! এটা হলো বাজে খরচ, আর কাজের খরচ হচ্চে ছোটলোকদের ইস্কুল করে দেওয়া! তা ছাড়া বামুনের ছেলে সন্ধ্যা-আহ্নিক কিছুই করে না, শুনি মোছলমানের হাতে পর্যন্ত জল খায়! দু'পাতা ইংরেজি পড়ে আর কি তার জাতজন্ম আছে দিদি, কিছুই নেই। শাস্তি তার গেছে কোথা? সমস্তই তোলা আছে, তা একদিন সবাই দেখবে।

[রমা নীরব]

বেণী। এখন যাই, সময় মত আর একবার দেখা করব। বাইরে বোধ করি এতক্ষণে গোবিন্দখুড়ো এসে বসে আছে।

রমা। আমিও এখন যাই বড়দা।

[উভয়ের প্রস্থান]

[রমেশের প্রবেশ]

রমেশ। রাধা, রাধা!

[দাসীর প্রবেশ]

রাধা। কেন ছোটবাবু?

রমেশ। জ্যাঠাইমা কি পূজোর ঘর থেকে বেরিয়েচেন? তখন একটা কথা তাঁকে বলতে ভুলেছিলাম।

রাধা। এখনো বেরোন নি। ডেকে দেব?

রমেশ। না না, থাক। বিকেলে আসবো তাঁকে বোলো।

রাধা। আচ্ছা।

[দাসীর প্রস্থান]

[দ্রুতপদে গোপাল সরকারের প্রবেশ]

রমেশ। আপনি এখানে যে?

গোপাল। অপেক্ষা করবার সময় নেই ছোটবাবু, আপনাকে চতুর্দিকে খুঁজে বেড়াচ্চি। শুনেচেন ভৈরব আচায্যির কাণ্ড? শুনেচেন, কি সর্বনাশ আমাদের সে করেচে?

রমেশ। কে না।

গোপাল। কর্তা স্বর্গীয় হলেন, শোকে-দুঃখে ভাবলাম আর না, এবারে শান্তি হব। কিন্তু হোতে দিলে না। আপনি কিন্তু আমাকে বাধা দিতে পারবেন না ছোটবাবু, আচায্যিকে আমি শাস্তি দেবো, দেবো, দেবো! এর প্রতিশোধ নেবো, নেবো, নেবো! আমি আজই যাচ্চি সদরে।

রমেশ। ব্যাপার কি সরকারমশাই? আপনার মত শান্ত মানুষে এতখানি উতলা হয়ে উঠেচে, কি করলেন আচায্যিমশাই?

গোপাল। কি করলেন? নেমকহারাম, শয়তান! তখনি মনে হয়েছিল, যাক ওর ভিটেমাটি বিক্রি হয়ে, আমরা এতে মাথা দেব না। কিন্তু তখনি ভয় হোলো কর্তা হয়ত

স্বর্গে থেকে দুঃখ পাবেন। জানি ত তাঁর স্বভাব। তাই আপনাকে নিষেধ করতে পারলাম না।

রমেশ। তবুও যে কিছুই বুঝলাম না সরকারমশাই?

গোপাল। সেদিন আপনার আদেশ-মত সদরে গিয়ে ওর ডিক্রির টাকাটা জমা দিয়ে মকদ্দমার সমস্ত ব্যবস্থা স্থির কোরে এলাম, আর আজ এইমাত্র খবর পেলাম—পরশু ভৈরব আচায্যি নিজে গিয়ে দরখাস্ত কোরে মামলা তুলে নিয়েছে। দেনা স্বীকার করেচে।

রমেশ। তার মানে?

গোপাল। তার মানে জমা দেওয়া অতগুলো টাকা আমাদের গেল। আমাদের মাথায় কাঁটাল ভেঙ্গে তিনজনে এখন বখরা করে খাবে। গোবিন্দ গাঙ্গুলী, বড়বাবু, আর ও নিজে। শোনেন নি সকাল থেকে আচায্যিবাড়িতে রোশনচৌকির সানাইয়ের বাদ্যি? ঘটা কোরে হবে দৌহিত্রের অন্নপ্রাশন, ওই টাকায় দেশসুদ্ধ বামুনের দল ফলার করে বাঁচবে। অথচ আপনার স্থান নেই,—স্থান হয়েচে গোবিন্দ গাঙ্গুলীদের। আপনাকে করেছে তারা ‘একঘরে’।

রমেশ। ভৈরব আচায্যি? পারলে করতে সে?

গোপাল। পারলে বৈ কি। পাড়াগাঁয়ের লোকে পারে না কি তাই শুধু আমার জানতে বাকী। আমি চললাম। ৬০

রমেশ। যান। আমি শুধু ভাবি, এ মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত হবে কিসে?

গোপাল। আমার সাক্ষী আছে, আদালত খোলা আছে, আমি তাকে সহজে ছাড়ব না ছোটবাবু।

[প্রস্থান]

রমেশ। জানিনে আইনে কি বলে। জানিনে কৃতঘ্নতার দণ্ড আদালতে হয় কি না। কিন্তু থাক সে! আমি নিলাম আজ নিজের হাতে এই ভার। কেবল সহ্য করে যাওয়াই জগতে পরম ধর্ম নয়।

[প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[ভৈরব আচার্যের বহির্বাটী। দৌহিত্রের অন্নপ্রাশন-উপলক্ষে দ্বারে মঙ্গলঘট স্থাপিত হইয়াছে। আম্রপল্লবের মালা গাঁথিয়া সম্মুখে ঝুলাইয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রাঙ্গণের একপ্রান্তে রোশনচৌকি বাদ্যকরের দল উপবিষ্ট। সম্মুখের বারান্দায় বসিয়া গোবিন্দ গাঙ্গুলী, বেণী ঘোষাল প্রভৃতি ভদ্রলোক। কেহ হাসিতেছে, কেহ ধূমপান করিতেছে। একজন বৈষ্ণব ও তাহার বৈষ্ণবী কীর্তন গাহিতেছিল, এবং তাহাই সকলে পরমানন্দে শ্রবণ করিতেছে। গান শেষ হইলে দীনু ভট্টাচার্য হুঁকা রাখিয়া বাহিরে যাইতেছিল, এমনি সময়ে রমেশ আসিয়া প্রবেশ করিল। দেখিলেই বুঝা যায় সে অতিশয় উত্তেজিত হইয়া আসিয়াছে। তাহার অপ্রত্যাশিত আবির্ভাবে উপস্থিত সকলেই চঞ্চল হইয়া উঠিল]

গান

শ্রীমতী করিছে বেশ।

ভুলাতে নাগর

শ্যাম নটবর

নানা ছাঁদে বাঁধে কেশ।

(আহা) শ্রীমতী করিছে বেশ।

হেরিয়া মুকুরে
চাঁচর চিকুরে

বিনায়ে বিনায়ে বিনোদ গোখুরে

রাধা বাঁধিল কবরী কত

কেহ হল নাক মনোমত (হায় রে),

ফণি-গঞ্জিত বেণী বিনোদিনী

দুলাইয়া দিল শেষ

(আহা) শ্রীমতী করিছে বেশ।

বেণী গেল ছুটি

লঙ্ঘিয়া কটি

পরশি মেখলা নিতম্বে লুটি

চুম্বিলা পাদদেশ।

উজ্জ্বল দু'টি নয়নপ্রান্তে কজ্জল দিল টানি

ফুলধনু জিনি ভ্রূযুগ মাঝে দীপসম টিপখানি।

ভরিয়া দু' করে স্বর্ণবিন্দু

মার্জিল ধনী বদন ইন্দু

নন্দিতে শ্যামসুন্দর-হৃদি–বন্দিতে কমলেশ।

রমেশ। আচায্যিমশাই কৈ?

দীনু। (কাছে আসিয়া) চল, বাবা চল, বাড়ি ফিরে চল। তুমি যে উপকার আচায্যির করেচো সে ওর বাবা করতো না। কিন্তু উপায় ত নেই। কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে সকলকেই ঘর করতে হয়, তোমাকে নেমন্তন্ন করতে গেলে,—বুঝলে না বাবা,—ভৈরবকে নেহাত দোষ দেওয়াও যায় না। তোমরা সব আজকালকার শহরের ছেলে, জাত-টাত ত তেমন মানো না—তাতেই বুঝলে না বাবা,—দু'দিন পরে ওর ছোট মেয়েটা বছর বারোর হলো ত,—পার করতেও ত হবে,—আমাদের সমাজের ব্যাপার বুঝলে না বাবা—

রমেশ। আজ্ঞে হাঁ বুঝেচি। তিনি কৈ?

দীনু। আছে আছে, বাড়িতেই আছে। কিন্তু বামুনকেই বা দোষ দিই কি করে? (সকলের দিকে চাহিয়া) আমাদের বুড়োমানুষের পরকালের ভয়ও ত একটা—

রমেশ। সে ত ঠিক কথা। কিন্তু ভৈরব কোথায়?

[ভৈরবের প্রবেশ]

ভৈরব। (সবিস্ময়ে বেণীবাবুর উদ্দেশ্যে) দেখুন বড়বাবু, আপনার পাছে কষ্ট হয়—

[অকস্মাৎ সম্মুখে রমেশকে দেখিয়া সে বজ্রাহতের ন্যায় স্তব্ধ হইয়া গেল]

রমেশ। (দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া তাহার একটা হাত সবলে চাপিয়া ধরিয়া) কেন এমন করলেন? আজ আমি—

ভৈরব। বড়বাবু—গোবিন্দ গাঙ্গুলীমশাই—দেখুন না একবার—

রমেশ। (ভৈরবকে সজোরে একটা ঝাঁকুনি দিয়া) বড়বাবু, গোবিন্দ—আজি আমি সবাইকে দেখাবো! বলুন কেন এ কাজ করলেন?

[বেণী প্রভৃতি সকলের দ্রুতবেগে পলায়ন]

ভৈরব। (কাঁদিয়া উঠিয়া) লক্ষ্মী রে, পুলিশে খবর দে রে! মেরে ফেললে রে—

রমেশ। চুপ! বলুন, কিসের জন্যে এ কাজ করলেন?

ভৈরব। মেরে ফেললে রে! বাবা রে!

রমেশ। মেরেই ফেলবো। আজ তোমাকে খুন করে তবে বাড়ি যাবো।

[এই বলিয়া সে পুনঃ পুনঃ ঝাঁকুনি দিতে লাগিল। লক্ষ্মী আসিয়া পড়িয়া আর্তনাদ করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে বহু লোক সমবেত হইয়া চারিদিক হইতে উঁকিঝুঁকি মারিতে লাগিল]

[দ্রুতবেগে রমার প্রবেশ]

রমা। (রমেশের হাত চাপিয়া ধরিয়া) হয়েচে,—এবার ছেড়ে দাও।

রমেশ। কেন শুনি?

রমা। এই লোকটার গায়ে তুমি হাত দেবে?

রমেশ। একে আমি কিছুতেই ছাড়বো না।

রমা। (জোর করিয়া হাত ছাড়াইয়া দিয়া) এত লোকের মাঝখানে এই লোকটার গায়ে হাত দিতে তোমার লজ্জা করচে না, কিন্তু আমি যে লজ্জায় মরে যাই রমেশদা! বাড়ি যাও।

রমেশ। মুহূর্তকাল বিহ্বল-চক্ষে তাহার প্রতি চাহিয়া থাকিয়া) আচ্ছা। বাড়িই চললাম।

[রমেশ ধীরে ধীরে প্রস্থান করিতে বেণী, গোবিন্দ প্রভৃতি সকলে ভিড় করিয়া আসিয়া পড়িল। ভৈরব বসিয়া পড়িয়া দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজিয়া কাঁদিতে লাগিল]

গোবিন্দ। বাড়ি চড়াও হয়ে যে আধমরা করে গেল, এর কি করবে এখন সেই পরামর্শ করো।

বেণী। আমিও ত তাই বলি।

রমা। কিন্তু এ পক্ষের দোষও ত কম নয় বড়দা? তা ছাড়া হয়েচেই বা কি যে এই নিয়ে হৈচৈ করতে হবে?

বেণী। বল কি রমা, এ কি সোজা ব্যাপার হোলো? আমরা সবাই না থাকলে ত সে খুন করে যেতো।

রমা। করলেও তোমরা আটকাতে পারতে না বড়দা। পালালে কেন?

বেণী। পালালাম?

গোবিন্দ। পালাবো আমরা? আমরা শুধু আড়াল থেকে দেখছিলাম ওর দৌড় কত?

লক্ষ্মী। তুমি ত ওর হয়ে বলবেই রমাদিদি। তোমার বাপকে কেউ ঘরে ঢুকে মেরে গেলে কি করতে বল ত?

রমা। আমার বাপ ও তোমার বাপে অনেক তফাত লক্ষ্মী, তুমি সে তুলনা কোরো না। কিন্তু আমি কারও হয়েই কথা বলিনি, ভালোর জন্যই বলেচি।

লক্ষ্মী। বটে! ওর হয়ে কোঁদল করতে তোমার লজ্জা করে না? বড়লোকের মেয়ে বলে কেউ ভয়ে কথা বলে না, নইলে কে না শুনেচে? তুমি বলে তাই মুখ দেখাও, আর কেউ হলে গলায় দড়ি দিতো।

বেণী। (লক্ষ্মীকে তাড়া দিয়া) তুই থাম না লক্ষ্মী—কাজ কি ও-সব কথায়?

লক্ষ্মী। কাজ নেই কেন? যার জন্যে বাবাকে এত দুঃখ পেতে হোলো তার হয়েই উনি কোঁদল করবেন? বাবা যদি আজ মারা যেতেন?

রমা। (লক্ষ্মীর প্রতি) লক্ষ্মী, ওঁর মত লোকের হাতে মরতে পাওয়া ভাগ্যের কথা। আজ মারা পড়লে তোমার বাবা স্বর্গে যেতে পারতো।

লক্ষ্মী। তাতেই বুঝি তুমি মরেচো রমাদিদি?

রমা। (ক্ষণকাল নীরবে তাহার প্রতি চাহিয়া থাকিয়া মুখ ফিরাইয়া লইল) কিন্তু কথাটা কি তুমিই বল ত বড়দা?

বেণী। কি করে জানবো বোন! লোকে কত কথা বলে—তাতে কান দিলে ত চলে না।

রমা। লোকে কি বলে?

বেণী। বললেই বা রমা। লোকের কথাতে ত গায়ে ফোস্কা পড়ে না। বলুক না।

রমা। তোমার গায়ে হয়ত কিছুতেই ফোস্কা পড়ে না, কিন্তু সকলের গায়ে ত গণ্ডারের চামড়া নেই? কিন্তু লোককে এ কথা বলাচ্চে কে? তুমি?

বেণী। আমি?

রমা। তুমি ছাড়া আর কেউ নয়। পৃথিবীতে কোন দুষ্কর্মই ত তোমার বাকি নেই,—জাল, জোচ্চুরি, চুরি, ঘরে আগুন দেওয়া সবই হয়ে গেছে, এটাই বা বাকী থাকে কেন? মেয়েমানুষের এতবড় সর্বনাশ যে আর নেই সে বোঝবার তোমার শক্তি নেই। কিন্তু জিজ্ঞেসা করি কিসের জন্য এ শত্রুতা তুমি করে বেড়াচ্চো? এ কলঙ্ক রটিয়ে তোমার লাভ কি?

বেণী। আমার লাভ কি হবে? লোকে যদি তোমাকে রাত্রে রমেশের বাড়ি থেকে বার হতে দেখে,—আমি করব কি?

রমা। এত লোকের সামনে আর সব কথা আমি বলতে চাইনে, কিন্তু তুমি মনে করো না বড়দা, তোমার মনের ভাব আমি টের পাইনি। কিন্তু তুমি নিশ্চয় জেনো,—আমি রমা। যদি মরি, তোমাকেও জ্যান্ত রেখে যাবো না।

[দ্রুতবেগে প্রস্থান]

গোবিন্দ। অ্যাঁ? এ হোলো কি বড়বাবু? তোমাকেও চোখ রাঙ্গিয়ে যায়,—মেয়েমানুষ হয়ে? আমি বেঁচে থেকে এও চোখে দেখতে হবে?

বেণী। (নিজের ললাট স্পর্শ করিয়া) কারও দোষ নয় খুড়ো, দোষ এর। কলিকাল,—এরই নাম কাল-মাহাত্ম্য। ভালো ছাড়া কখনো কারো মন্দ করিনে, মন্দ করার কথা ভাবতে পারিনে। জগতে আমার এমন হবে না ত হবে কার? বিদ্যেসাগরের কি হয়েছিল? গল্প শুনেচো ত!

গোবিন্দ। তা আর শুনিনি!

বেণী। তবে তাই! দোষ দেবো আর কাকে? (ভৈরবকে দেখাইয়া) এঁকে রক্ষে করতে না যেতাম ত কোন কথাই হতো না! কিন্তু সে ত আর আমি প্রাণ থাকতে পারিনে!

তৃতীয় দৃশ্য

বনাকীর্ণ নির্জন গ্রাম্যপথ

[রমেশ দ্রুতপদে প্রবেশ করিল। রমা অন্তরাল হইতে ডাকিল—রমেশদা? এবং পরক্ষণেই সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল]

রমেশ। রমা! এত দূরে এই নির্জন পথে তুমি?

রমা। আমি জানি পীরপুরের ইস্কুলের কাজ সেরে এই পথে আপনি নিত্য যান।

রমেশ। তা যাই। কিন্তু তুমি কেন?

রমা। শুনেছিলাম এখানে আর আপনার শরীর ভাল থাকচে না। এখন কেমন আছেন?

রমেশ। ভালো নয়। মনে হয় রোজ রাত্রেই যেন জ্বর হয়।

রমা। তা হলে কিছুদিন বাইরে ঘুরে এলে ত ভাল হয়!

রমেশ। (হাসিয়া) ভাল ত হয় জানি, কিন্তু যাই কি কোরে?

রমা। হাসলেন যে বড়? আপনি বলবেন আপনার অনেক কাজ, কিন্তু এমন কাজ কি আছে যা নিজের শরীরের চেয়েও বড়?

রমেশ। নিজের শরীরটা যে ছোট জিনিস তা আমি বলিনে। কিন্তু এমন কাজ মানুষের আছে যা এই দেহটার চেয়েও বড়। কিন্তু সে ত তুমি বুঝবে না রমা।

রমা। আমি বুঝতেও চাইনে। কিন্তু আপনাকে আর কোথাও যেতেই হবে। সরকারমশায়কে বলে দিয়ে যান আমি তাঁর কাজকর্ম দেখবো।

রমেশ। তুমি দেখবে আমার কাজকর্ম?

রমা। কেন, পারবো না?

রমেশ। পারবে। হয়ত আমার নিজের চেয়েও ভাল পারবে, কিন্তু পেরে কাজ নেই। আমি তোমাকে বিশ্বাস করবো কি করে?

রমা। রমেশদা, ইতরে বিশ্বাস করতে পারে না। কিন্তু আপনি পারবেন। না পারলে সংসারে বিশ্বাস করার কথাটা উঠে যাবে। আমাকে এই ভারটুকু আপনি দিয়ে যান।

রমেশ। (ক্ষণকাল নীরবে তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া) আচ্ছা, ভেবে দেখি।

রমা। কিন্তু ভাববার ত সময় নেই। আজই আপনাকে আর কোথাও যেতে হবে। না গেলে

রমেশ। (পুনশ্চ তাহার মুখের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া) তোমার কথার ভাবে মনে হয়, না গেলে আমার বিপদের সম্ভাবনা। ভালো, যাই-ই যদি তাতে তোমার লাভ কি? আমাকে বিপদে ফেলতে তুমি নিজেও ত কম চেষ্টা করোনি যে, আজ আর একটা বিপদে সতর্ক করতে এসেচো। সে-সব কাণ্ড এত পুরোনো হয়নি যে তোমার মনে নেই। বরঞ্চ খুলে বলো আমি চলে গেলে তোমার নিজের কি সুবিধে হয়,—হয়ত তোমার জন্যে আমি রাজী হতেও পারি।

রমা। (এই কঠিন আঘাতে রমার মুখ বিবর্ণ হইয়া উঠিল, কিন্তু আপনাকে সে সামলাইয়া লইল) আচ্ছা, খুলেই বলচি। আপনি গেলে আমার লাভ কিছুই নেই, কিন্তু না গেলে অনেক ক্ষতি। আমাকে সাক্ষী দিতে হবে।

রমেশ। এই? মাত্র এইটুকু? কিন্তু সাক্ষী না দিলে?

রমা। না দিলে আমার মহামায়ার পূজোয় কেউ আসবে না, আমার যতীনের উপনয়নে কেউ খাবে না, আমার বারব্রত, ধর্মকর্ম,—না রমেশদা, আপনি যান আমি মিনতি করচি। থেকে, সব দিক দিয়ে আমাকে নষ্ট করবেন না।

রমেশ। (একমুহূর্ত মৌন থাকিয়া) বেশ, আমি যাবো। আমার আরব্ধ কাজ অসম্পূর্ণ রেখেই যাবো,—কিন্তু নিজের কাছে নিজেকে কি জবাব দেব?

রমা। জবাব নেই। আর কেউ হলে জবাবের অভাব ছিল না, কিন্তু এক অতি ক্ষুদ্র নারীর অখণ্ড স্বার্থপরতার উত্তর আপনি কোথায় খুঁজে পাবেন রমেশদা! আপনাকে নিরুত্তরেই যেতে হবে।

রমেশ। বেশ, তাই হবে। কিন্তু আজ আমার সাধ্য নেই।

রমা। সত্যিই সাধ্য নেই?

রমেশ। না। তোমার সঙ্গে কে আছে তাকে ডাকো।

রমা। সঙ্গে আমার কেউ নেই। আমি একাই এসেচি।

রমেশ। একা এসেছো? সে কি কথা রানী,—একলা এলে কোন্ সাহসে?

রমা। সাহস এই ছিল যে, আমি নিশ্চয় জানতাম এই পথে আপনার দেখা পাবো। তার পরে আর আমার ভয় কিসের?

রমেশ। ভালো করোনি রমা, সঙ্গে অন্ততঃ তোমার দাসীকেও আনা উচিত ছিল। এই নিস্তব্ধ জনহীন পথে আমাকেও ত তোমার ভয় করা কর্তব্য।

রমা। তোমাকে? ভয় করবো আমি তোমাকে?

রমেশ। নয় কেন?

রমা। (মাথা নাড়িয়া) না, কোনমতেই না। আর যা খুশি উপদেশ দাও রমেশদা, সে আমি শুনবো। কিন্তু তোমাকে ভয় করবার ভয় আমাকে দেখিয়ো না।

রমেশ। আমাকে তোমার এতই অবহেলা?

রমা। হাঁ, এতই অবহেলা। বলছিলে, দাসীকে সঙ্গে না এনে ভালো করিনি। কিন্তু কিসের জন্যে শুনি? ভেবেচো তোমার হাত থেকে বাঁচবার জন্যে দাসীর শরণাপন্ন হবো? রমার চেয়ে তোমার কাছে সে-ই হবে বড়? (রমেশ নিঃশব্দে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল) মনে নেই সকালের কথা? সেখানে লোকের অভাব ছিল না। তবু সেই মূর্তি দেখে সবাই যখন পালিয়ে গেল, তখন কে রক্ষে করেছিল ভৈরব আচায্যিকে? সে রমা। দাসী-চাকরের তখন প্রয়োজন হয়নি, এখনও হবে না। বরঞ্চ আজ থেকে তুমিই রমাকে ভয় কোরো। আর এই কথাটাই বলবার জন্যে আজ এসেছিলাম।

রমেশ। তা হলে নিরর্থক এসেচো রমা। ভেবেছিলাম তোমার নিজের কল্যাণের জন্যই আমাকে চলে যেতে বলচো। কিন্তু তা যখন নয়, তখন আমাকে সতর্ক করবার প্রয়োজন দেখতে পাইনে।

রমা। সমস্ত প্রয়োজনই কি সংসারের চোখে দেখা যায় রমেশদা!

রমেশ। যা যায় না তা আমি স্বীকার করিনে। চললাম।

[প্রস্থান]

রমা। (অকস্মাৎ কাঁদিয়া ফেলিয়া) যে অন্ধ তাকে আমি দেখাবো কি দিয়ে!

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[রমার পূজার দালানের একাংশ। দুর্গা-প্রতিমা স্পষ্ট দেখা যায় না বটে, কিন্তু পূজার যাবতীয় আয়োজন বিদ্যমান। সময় অপরাহ্ণ-প্রায়। এ-বেলার মত পূজার কার্য সম্পন্ন হইয়া গেছে। একধারে রমা স্থির হইয়া বসিয়া ছিল, তাহার বাটীর সরকার প্রবেশ করিয়া কহিল]

সরকার। মা, বেলা ত যায়, কিন্তু শূদ্দুররা ত কেউ এলো না। একবার ঘুরে দেখে আসবো কি?

রমা। কেউ এলো না?

সরকার। কৈ না।

[বেণী ঘোষালের প্রবেশ]

বেণী। ইস্! এত খাবার-দাবার নষ্ট কোরে দিতে বসেচে দেশের ছোটলোকের দল! এত বড় আস্পর্ধা! কিন্তু ব্যাটাদের শেখাবো, শেখাবো, শেখাবো! চাল কেটে যদি না তুলে দিই ত আমি—

[রমা তাহার মুখোপানে চাহিয়া শুধু একটুখানি হাসিল। কিছুই বলিল না]

না না, এ হাসির কথা নয় রমা, বড় সর্বনেশে কথা! একবার যখন জানবো এর মূলে কে তখন এই এমনি কোরে ছিঁড়ে ফেলব। আরে হারামজাদা ব্যাটারা এ বুঝিস নে যে,

যার জোরে তোরা জোর করিস, সেই রমেশবাবু যে নিজে জেলের ঘানি টেনে মরচেন! তোদের মারতে কতটুকু সময় লাগে? ভৈরব আচায্যিকে ছুরি মারতে ঢুকেছিল,—হাতে এত বড় ভোজালি স্পষ্ট প্রমাণ করে দিলাম। কৈ, কোন্ শালা আটকাতে পারলে? আর মনে করি যদি ত রাতকে দিন, দিনকে রাত করে দিতে পারি যে! আচ্ছা—আরো খানিকটা দেখি, তার পরে—শাস্তরে বলেছে যথা ধর্ম স্তথা জয়ঃ। শূদ্দুর হয়ে বামুনবাড়ির ধর্মকর্মের ওপর আড়ি? আচ্ছা—

[প্রস্থান]

[ধীরে ধীরে বিশ্বেশ্বরীর প্রবেশ]

বিশ্বেশ্বরী। রমা!

রমা। কেন মা?

বিশ্বেশ্বরী। চুপটি কোরে বসে আছিস মা, কে বলবে মানুষ। ঠিক যেন কে মাটির মূর্তি গড়ে রেখেচে। (ধীরে ধীরে তাহার পাশে আসিয়া বসিলেন) সে হাসি নেই, সে উল্লাস নেই,—যেন কোথায় কোন্ বহুদূরে চলে গেছিস।

রমা। (ঈষৎ হাসিয়া) বাড়ির ভেতরে এতক্ষণ কি করছিলে জ্যাঠাইমা?

বিশ্বেশ্বরী। তোমার যজ্ঞিবাড়িতে ত কাজ কম নেই মা। অন্ন-ব্যঞ্জনের যেন পাহাড় জমিয়ে তুলেচ।

রমা। এবারে কিন্তু সমস্ত মিছে। বোধ করি একজন চাষাও আমার বাড়িতে মায়ের প্রসাদ পেতে আসবে না। কিন্তু অন্যান্য বারের কথা জানো ত জ্যাঠাইমা, এই সপ্তমীর দিনে প্রজাদের ভিড় ঠেলে বাড়িতে ঢুকতে পারা যেত না।

বিশ্বেশ্বরী। এখনো বলা যায় না রমা। হয়ত সন্ধ্যের পরেই সবাই আসবে।

রমা। না, আসবে না জ্যাঠাইমা।

জ্যাঠাইমা। সবাই ওই কথাই বলচে। বেণী, গোবিন্দঠাকুরপো রাগে দাপাদাপি করে বেড়াচ্চে, ভেতরে তোর মাসীর গালাগালির জ্বালায় কান পাতবার জো নেই, কেবল তোর মুখেতেই নালিশ নেই। সে রাগ নেই, অভিমান নেই,—তোর চোখের পানে চাইলে মনে হয় যেন ওর নীচে কান্নার সমুদ্র চাপা আছে। কেমন কোরে এমন বদলে গেলি মা?

রমা। রাগ করব কাদের ওপর জ্যাঠাইমা? প্রজাদের ওপরে? গরীব বলে কি তাদের সম্ভ্রমবোধ নেই? তারা আমার মত পাপিষ্ঠার অন্ন গ্রহণ করবে কেন?

বিশ্বেশ্বরী। তোমাকে পাপিষ্ঠা বলে সাধ্য কার মা?

রমা। বললেও ত অন্যায় হয় না। তারা জানে আমরা তাদের ভালোবাসিনে, আমরা তাদের আপনার জন নই। আমরা ত আদর কোরে আহ্বান করিনে মা, আমরা জোর কোরে হুকুম করি দুটো খেয়ে যাবার জন্যে। তাই তাদের না আসায় আমরা রাগে ক্ষেপে উঠি।—কিন্তু আদর যে কি, সে স্বাদ তারা পেয়েচে, ভালোবাসা যে কি, সে তারা রমেশদার কাছে জেনেচে। তাদের সেই বন্ধুকেই আমরা যখন মিথ্যে মামলায়, মিথ্যে সাক্ষী দিয়ে জেলে পুরে এলাম, এ দুঃখ তারা ভুলবে কি করে জ্যাঠাইমা?

বিশ্বেশ্বরী। কিন্তু তুমি ত মিথ্যে সাক্ষী দাওনি মা?

রমা। দিইনি আমি? তাদের বড় আশা ছিল, আর যেই কেননা মিথ্যে বলুক, আমি বলতে পারব না। কিন্তু বলতে ত পারলাম। মুখে ত বাধল না! আচায্যিমশায়ের কত বড় অপরাধ, কত বড় কৃতঘ্নতা যে রমেশদাকে আত্মবিস্মৃত করেছিল, সে ত আমি জানি।

আমি ত জানি তাঁর হাতে একটা তৃণ পর্যন্ত ছিল না, তবু আদালতে দাঁড়িয়ে স্মরণ করতেই পারলাম না, হাতে তাঁর ছুরি-ছোরা ছিল কি না!

বিশ্বেশ্বরী। রমা–

রমা। জ্যাঠাইমা, তুমি বলছিলে মিথ্যে ত আমি বলিনি। এখানকার আদালতে হলফ কোরে মিথ্যে হয়ত আমি বলিনি, কিন্তু যে আদালতে হলফ করার বিধি নেই, সেখানে আমি কি জবাব দেবো? উঃ–ভগবান! সত্য-গোপনের যে এতবড় বোঝা এ আমাকে তুমি আগে জানতে দাওনি কেন?

বিশ্বেশ্বরী। কিন্তু আমি তোমাকে বলচি মা, শাস্তি তার হয়েচে সত্যি, কিন্তু অকল্যাণ তার কখনো হবে না।

রমা। হবে কি কোরে জ্যাঠাইমা, আজ সমস্ত অকল্যাণের ভার এসে পড়েচে যে আমার মাথার ওপর।

বিশ্বেশ্বরী। একলা তোমার মাথায় পড়েনি মা, আমরা সবাই মিলে তাকে ভাগ কোরে নিয়েচি। অসত্যাচারী সমাজের যে কাপুরুষের দল মিথ্যে দুর্নামের ভয় দেখিয়ে তোমাকে ছোট করেচে, এ পাপের ভারে তাদের মাথা আজ পথের ধূলায়। বেণীর মা আমি, আমার মাথা মাটিতে লুটোচ্চে রমা, কখনও আর তুলতে পারব না।

রমা। অমন কথা তুমি বোলো না জ্যাঠাইমা। কিন্তু আমি কি করেছিলাম জানো? জনশূন্য অন্ধকার-পথে একলা দেখা কোরে সেধেছিলাম, রমেশদা, তুমি যাও,–যাও এখান থেকে। বিশ্বাস করলেন না, বললেন, আমি চলে গেলে তোমার লাভ কি? আমার লাভ? হঠাৎ ব্যথার ভারে যেন পাগল হয়ে গেলাম। বললাম, লাভ কিছুই নেই,–কিন্তু না গেলে আমার অনেক ক্ষতি। আমার মহামায়ার পূজোয় কেউ আসবে না, আমার যতীনের উপনয়নে কেউ খাবে না,–তুমি দেশে থেকে আমাকে সকল দিক দিয়ে নষ্ট কোরো না।

কিন্তু এতবড় মিথ্যে আমি কোথায় পেলাম জ্যাঠাইমা? রাগ কোরে বললেন, এই? এইমাত্র? না, এর জন্যে আমার কাজ ছেড়ে আমি কোনমতেই যাব না। অভিমানে ভাবলাম, তবে হোক একটা শিক্ষা। বিশ্বাস ছিল, সামান্য কিছু একটা জরিমানা হবে। কিন্তু সে শাস্তি যে এমনি কোরে আসবে,—তাঁর রোগশীর্ণ মুখের পানে চেয়েও বিচারকের দয়া হবে না,—তাঁকে জেলে দেবে এ কথা আমার অতিবড় দুঃস্বপ্নেও ভাবতে পারিনি জ্যাঠাইমা।

বিশ্বেশ্বরী। সে জানি মা।

রমা। শুনলাম, আদালতে তিনি কেবল আমার পানেই চেয়েছিলেন। তাঁর গোপাল সরকার চাইলেন আপিল করতে, তিনি বললেন, না। সারা জীবন যদি জেলের মধ্যে বাস করতে হয় সেও ঢের ভাল, কিন্তু আপিল করে খালাস পেতে চাইনে। এ শাস্তি আমার কত বড় বল ত জ্যাঠাইমা?

বিশ্বেশ্বরী। কিন্তু তার মিয়াদের কালও পূর্ণ হয়ে এলো। মুক্তি পেতে আর বেশী দিন নেই।

রমা। তাঁর মুক্তি হবে, কিন্তু তাঁর সেই নিবিড় ঘৃণা থেকে ইহজীবনে আমার ত মুক্তি নেই মা!

[বৃদ্ধ সনাতন হাজরাকে লইয়া বেণীর প্রবেশ]

বেণী। এই আমাদের তিনপুরুষের প্রজা। সুমুখে দিয়ে যাচ্ছিলেন, ডাকতে তবে বাড়ি ঢুকলেন। হাঁ রে সনাতন, এত অহঙ্কার কবে থেকে হোল রে? বলি, তোদের ঘাড়ে কি আর একটা কোরে মাথা গজিয়েচে রে?

সনাতন। দুটো করে মাথা আর কার থাকে বড়বাবু? আপনাদেরই থাকে না ত আমাদের মত গরীবের!

বেণী। কি বললি রে হারামজাদা?

সনাতন। দুটো মাথা কারো থাকে না বড়বাবু, সেই কথাই বলেচি,—আর কিছু নয়।

[গোবিন্দ গাঙ্গুলীর প্রবেশ]

গোবিন্দ। তোদের বুকের পাটা শুধু দেখচি আমরা। মায়ের প্রসাদ পেতেও কেউ তোরা এলিনে, বলি, কেন বল ত রে?

সনাতন। (হাসিয়া) আর বুকের পাটা? যা করবার সে ত আমার করেচেন। সে যাক। কিন্তু মায়ের প্রসাদই বলুন আর যাই বলুন, কোন কৈবর্তই আর বামুনবাড়িতে পাত পাতবে না। এত পাপ যে মা বসুমাতা কেমন করে সইচেন, তাই আমরা কেবল বলাবলি করি। (নিশ্বাস ফেলিয়া রমার প্রতি চাহিয়া) একটু সাবধানে থেকো দিদিঠাকরুন, পীরপুরের ছোঁড়ার দলটা একেবারে ক্ষেপে রয়েচে। এর মধ্যেই দু'তিনবার তারা বড়বাবুর বাড়ির চারপাশে ঘুরে গেছে—সামনে পায়নি তাই রক্ষে। (বেণীর প্রতি) একটু সামলে-সুমলে থাকবেন বড়বাবু, রাতবিরেতে বার হবেন না।

[বেণী কি-একটা বলিতে গেল কিন্তু ভয়ে তাহার মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না]

রমা। (স্নেহার্দ্র-কণ্ঠে) সনাতন, ছোটবাবুর জন্যেই বুঝি তোমাদের সব রাগ এত?

সনাতন। মিথ্যে বোলে আর নরকে যাব না দিদিঠাকরুন, তাই বটে। তবে, পীরপুরের লোকগুলোর রাগটাই সবচেয়ে বেশি। তারা ছোটবাবুকে দেব্‌তা মনে করে।

রমা। (আনন্দোজ্জ্বল মুখে) তাই নাকি সনাতন?

বেণী। (সনাতনের হাত চাপিয়া ধরিয়া) তোকে একবার দারোগার কাছে গিয়ে বলতে হবে সনাতন। তুই যা চাইবি তাই দেব। তোর সেই সাবেক দু'বিঘে জমি ছাড়িয়ে নিতে চাস ত তাই পাবি। ঠাকুরঘরে বসে দিব্বি করচি সনাতন, বামুনের কথাটা রাখ।

সনাতন। সে দিনকাল আর নেই বড়বাবু,—সে দিনকাল আর নেই। ছোটবাবু সব উল্টে দিয়ে গেছেন।

গোবিন্দ। বামুনের কথা তা হলে রাখবি নে বল?

সনাতন। (মাথা নাড়িয়া) না। বললে তুমি রাগ করবে গাঙ্গুলীমশাই, কিন্তু সেদিন পীরপুরের নূতন ইস্কুলঘরে ছোটবাবু বলেছিলেন, গলায় গাছকতক সুতো ঝোলানো থাকলেই বামুন হয় না। আমি ত আজকের নই ঠাকুর, সব জানি। যা কোরে তোমরা বেড়াও সে কি বামুনের কাজ? তোমাকেই জিজ্ঞেসা করচি দিদিঠাকরুন, তুমিই বল দিকি?

[রমা নিরুত্তরে মাথা হেঁট করিল]

সনাতন। (মনের আক্রোশ মিটাইয়া বলিতে লাগিল) বিশেষ কোরে ছোঁড়াদের দল। এই দুটো গাঁয়ের যত ছোকরা সন্ধ্যের পরে সবাই গিয়ে জোটে মোড়লের বাড়িতে। তারা ত স্পষ্ট বলে বেড়াচ্চে জমিদার'ত ছোটবাবু! আর সব চোর-ডাকাত। তা ছাড়া খাজনা দিয়ে বাস করব, ভয় কারুকে করব না। আর বামুনের মত থাকে ত বামুন, নইলে, আমরাও যা তারাও তাই।

বেণী। (আতঙ্কে পরিপূর্ণ হইয়া) সনাতন, আমার ওপরেই কেন এত রাগ বলতে পারিস?

সনাতন। তা আর পারিনে বড়বাবু? আপনিই যে সকল নষ্টের গোড়া তা কারও জানতে বাকী নেই।

[বেণী চুপ করিয়া রহিল, ভয়ে বুকের ভিতর তাহার টিপটিপ করিতেছিল]

বিশ্বেশ্বরী। গাঙ্গুলী-ঠাকুরপো, ছোটলোকের মুখে এত আস্পর্ধার কথা শুনেও যে বড় চুপ করে আছ?

[বেণী বক্রচক্ষে মায়ের প্রতি ক্রুদ্ধ দৃষ্টিপাত করিয়াও নীরব হইয়া রহিল]

গোবিন্দ। হাঁ সনাতন, বিপিন মোড়লের বাড়িতেই তা হলে আড্ডা বল? সেখানে কি করে তারা বলতে পারিস?

সনাতন। কি করে তা জানিনে। কিন্তু ভাল চাও ত ও-মতলব কোরো না ঠাকুর। তারা ছোট-বড় সবাই ভাই-সম্পর্ক পাতিয়েচে। এক মন, এক প্রাণ। ছোটবাবুর জেল হওয়া থেকে সব রাগে বারুদ হয়ে আছে, তার মধ্যে গিয়ে চকমকি ঠুকে আগুন জ্বালতে যেয়ো না গাঙ্গুলীমশাই। এই তোমাদের সাবধান করে দিয়ে গেলাম।

[প্রস্থান]

[সনাতন প্রস্থান করিলে সকলেই কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া]

বেণী। ব্যাপার শুনলে রমা?

[রমা মুচকিয়া হাসিল, কথা কহিল না। হাসি দেখিয়া বেণীর গা জ্বলিয়া গেল]

বেণী। শালা ভৈরবের জন্যেই এত কাণ্ড। আর তুমি না যাবে সেখানে, না তাকে ছাড়িয়ে দেবে তো এ–সব কিছুই হয় না। খেতো শালা মার,–তোমার কি!

[রমা পুনরায় একটু হাসিল, জবাব দিল না]

বেণী। তুমি ত হাসবেই রমা। মেয়েমানুষ, বাড়ির বার হতে ত হয় না,—কিন্তু আমাদের উপায় কি হবে বল ত? সত্যি সত্যিই যদি একদিন মাথা ফাটিয়ে দেয়? মেয়েমানুষদের সঙ্গে কাজ করতে গেলেই এই দশা হয়।

[রমা বিস্মিত-মুখে শুধু তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল]

বেণী। গোবিন্দখুড়ো, চুপ করে বসে থাকলে কি হবে? আমার দরোয়ান আর চাকর দু'জনকে একবার ডেকে পাঠাও না? গোটা দুই আলো যেন সঙ্গে কোরে আনে।

গোবিন্দ। এস না, বাইরে গিয়ে ডাকতে পাঠাই। আর ভয়টা কিসের? না হয়, আমি নিজে গিয়ে তোমাকে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসব।

[উভয়ের প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য

পথ

[জগন্নাথ ও নরোত্তমের প্রবেশ। জগন্নাথের হাতে একগাছা মোটা লাঠি]

নরোত্তম। এই পথ, এইখান দিয়ে যাবে। জগা, এখনো বল, সাহস হবে ত?

জগন্নাথ। সাহস হবে না কি রে! শাস্তি নিতে রাজী হয়েই ত শাস্তি দিতে দাঁড়িয়েচি। অনেক দুঃখু দিয়েচে। মা দুর্গা! শুধু এই করো, আজ যেন একটা কাজের মত কাজ করে যেতে পারি। যেন হাত না কাঁপে।

নরোত্তম। হাত কাঁপবে কি রে?

জগন্নাথ। তা পারে। বাপ-পিতামোর কাল থেকে মার খাওয়াটাই অভ্যাস হয়ে আছে কিনা! তাই শেষ পর্যন্ত হাত যদি না ওঠে ত হাতের দোষ, আমার নয়।

নরোত্তম। তবে লাঠিগাছটা আমার হাতে দিয়ে তুই সরে দাঁড়া। দেখি আমি কি করতে পারি।

জগন্নাথ। অমন কথা তুই বলিস নে নরু। তোর ছেলেপুলে আছে, কিন্তু আমার নেই। এই আমার সময়। ছোটবাবু ফিরে এলে আর হবে না, তিনি হাত চেপে ধরবেন। তাই তাঁর জেল থেকে বেরোবার আগেই তার শোধ নিয়ে আমি জেলে গিয়ে ঢুকবো। তুই ঘরে যা।

নরোত্তম। ঘরে যাব না, কাছেই থাকব জগা।

[নরোত্তমের প্রস্থান। অপর দিক দিয়া গোবিন্দ,
বেণী ও দরোয়ানের প্রবেশ। হাতে তাহার লণ্ঠন]

বেণী। (চমকিয়া) দাঁড়িয়ে কে রে?

জগন্নাথ। আমি জগন্নাথ।

গোবিন্দ। পথে দাঁড়িয়ে লোক ভাঙ্গান হচ্চে, কেউ না খেতে যায়! না রে হারামজাদা?

জগন্নাথ। গাল দিয়ো না বলচি গাঙ্গুলীমশাই।

বেণী। গাল দেবে না হারামজাদা—শালা! কাল চাল কেটে ভিটেয় সরষে বুনে দেব জানিস?

জগন্নাথ। অনেকের দিয়েচ জানি, কিন্তু আর না দিতে পার আমি তার ব্যবস্থা কোরে যাব।

বেণী। কি ব্যবস্থা করবি রে হারামজাদা? শুনি?

[এই বলিয়া সে অগ্রসর হইয়া গেল]

জগন্নাথ। এই যে ব্যবস্থা!

[এই বলিয়া সে বেণীর মাথায় সজোরে আঘাত করিল]

বেণী। (বসিয়া পড়িয়া) বাবা রে! গেছি রে বাবা!
[গোবিন্দ ও দরোয়ান চীৎকার করিয়া দ্রুতপদে পলায়ন করিল।

বেণী। তোর পায়ে পড়ি বাবা, জগন্নাথ, ব্রহ্মহত্যা করিস নে। দোহাই বাবা, তোকে দশ বিঘে জমি দেব।

জগন্নাথ। জমি তোমার চাইনে—সে তোমার থাক। ব্রহ্মহত্যাও করব না!

বেণী। আজ থেকে তোর সঙ্গে বাপ-ব্যাটা সম্পর্ক জগন্নাথ—যা চাইবি তুই—

জগন্নাথ। কিছুই চাইব না। কিন্তু বাপ-ব্যাটার সম্পর্ক তোমার সঙ্গে? ছিঃ! আর সাবধান করে দিচ্চি বড়বাবু, এই মারই তোমার শেষ মার নয়। বাবু বোলে, বামুন বোলে যতই সয়েচি, ততই অত্যাচার বেড়ে গেছে। আর আমরা সইব না। দেখি তোমরা সিধে হও কিনা!

[প্রস্থান]

বেণী। বাবা রে, মরে গেছি রে! সব শালা পালাল রে!

[গোবিন্দ ও দরোয়ানের প্রবেশ]

গোবিন্দ। (হাঁপাইতে হাঁপাইতে) পালাবো কেন বাবা, পালাই নি। ছুটে লোক ডাকতে গিয়েছিলাম। জগা শালা কি-রকম গুণ্ডা জান ত? শালাকে ডাকাতির চার্জে পাঁচ বচ্ছর ঠেলে দেবো—তবে আমার নাম গোবিন্দ গাঙ্গুলী!

দরোয়ান। (হাঁপাইতে হাঁপাইতে) হাঁথ মে একঠো হাথিয়ার রহতা!

বেণী। দূর হ শালা সুমুখ থেকে। মেরে তক্তা বানিয়ে দিলে—(মাথায় হাত দিয়া দেখিয়া) বাবা গো! কি রক্ত পড়চে গো,—আর আমি বাঁচব না।

[বেণী শুইয়া পড়িল]

গোবিন্দ। (ধরিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়া) বাঁচবে, বাঁচবে। আমি নিজে তোমাকে কলকাতার হাসপাতালে নিয়ে যাব। (দরোয়ানের প্রতি) ধর না শালা ছাতুখোর। শালা ভয়ে শিয়ালের মত ছুটে পালাল।

দরোয়ান। কেয়া করে বাবুজি, বিন্ হাথিয়ার–

[উভয়ে বেণীকে তুলিয়া লইয়া প্রস্থান করিল]

তৃতীয় দৃশ্য

[রমার শয়নকক্ষ। পীড়িত রমা শয্যায় শায়িত। সম্মুখে প্রাতঃসূর্যালোক খোলা জানালার ভিতর দিয়া মেঝের উপর ছড়াইয়া পড়িয়াছে। বিশ্বেশ্বরী প্রবেশ করিলেন]

বিশ্বেশ্বরী। (অশ্রুভরা কণ্ঠে) আজ কেমন আছিস মা, রমা?

রমা। (একটুখানি হাসিয়া) ভাল আছি জ্যাঠাইমা!

বিশ্বেশ্বরী। রাত্রে জ্বরটা কি ছেড়েছিল?

রমা। না। কিন্তু বোধ হয় শিগগির একদিন ছেড়ে যাবে।

বিশ্বেশ্বরী। কাশিটা?

রমা। কাশিটা বোধ করি তেমনি আছে।

বিশ্বেশ্বরী। তবু বলিস ভাল আছিস মা! (রমা নিঃশব্দে হাসিল, বিশ্বেশ্বরী তাহার শিয়রে গিয়া বসিলেন এবং মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে দিতে কহিলেন) তোর হাসি দেখলে মনে হয় মা, যেন গাছ থেকে ছেঁড়াফুল দেবতার পায়ের কাছে পড়ে হাসছে! রমা?

রমা। কেন জ্যাঠাইমা?

বিশ্বেশ্বরী। আমি ত তোর মায়ের মত রমা—

রমা। মত কেন জ্যাঠাইমা, তুমিই ত আমার মা।

বিশ্বেশ্বরী। (হেঁট হইয়া রমার ললাট চুম্বন করিলেন) তবে সত্যি করে বল দেখি মা, তোর কি হয়েছে?

রমা। অসুখ করেচে জ্যাঠাইমা।

বিশ্বেশ্বরী। (রমার রুক্ষ চুলগুলিতে হাত বুলাইয়া কহিলেন) সে ত এই দুটো চামড়ার চোখেই দেখতে পাই মা। যা এতে ধরা যায় না তেমনি যদি কিছু থাকে মায়ের কাছে লুকোস নে রমা। লুকোলে ত অসুখ সারবে না মা!

রমা। (কিছুক্ষণ জানালার বাহিরে নিঃশব্দে চাহিয়া থাকিয়া) বড়দা কেমন আছেন জ্যাঠাইমা?

বিশ্বেশ্বরী। মাথার ঘা সারতে দেরি হবে বটে, কিন্তু হাসপাতাল থেকে পাঁচ–ছয় দিনেই বাড়ি আসতে পারবে।–দুঃখ কোরো না মা, এই তার প্রয়োজন ছিল। এতে তার ভালই হবে। ভাবচো, মা হয়ে সন্তানের এতবড় দুর্ঘটনায় এ কথা বলচি কি কোরে? কিন্তু তোমাকে সত্যি বলচি রমা, এতে আমি ব্যথা বেশি পেয়েচি কি আনন্দ বেশি পেয়েচি বলতে পারিনে। অধর্মকে যারা ভয় করে না, লজ্জা যাদের নেই, প্রাণের ভয়টা যদি না তাদের তেমনি বেশি থাকে মা, সংসার ছারখার হয়ে যায়। তাই কেবলই মনে হয়, এই চাষার ছেলে বেণীর যে মঙ্গল করে দিয়ে গেল পৃথিবীতে কোন আত্মীয়বন্ধুই তার সে ভাল করতে পারতো না। কয়লাকে ধুয়ে তার রং বদলানো যায় না মা, তাকে আগুনে পোড়াতে হয়।

রমা। কিন্তু এমনধারা ত আগে ছিল না জ্যাঠাইমা! কে দেশের চাষাদের এ-রকম কোরে দিলে?

জ্যাঠাইমা। সে কি তুই নিজেই বুঝিস নি মা, কে এদের বুক এমন কোরে ভরে দিয়ে গেছে। ওরা ভাবলে তাকে যেমন কোরে হোক জেলে বন্ধ করলেই আপদ চুকল। কিন্তু এ

কথা তারা ভাবলে না যে, আগুন জ্বলে উঠে শুধু শুধু নেবে না। জোর করে নেবালেও সে আশেপাশের জিনিস তাতিয়ে দিয়ে যায়।

রমা। কিন্তু এই কি ভালো জ্যাঠাইমা?

বিশ্বেশ্বরী। ভাল বৈ কি মা। একদিকে প্রবলের অত্যাচার করবার অখণ্ড স্পর্ধা, অন্য দিকে নিরুপায়ের সহ্য করবার তেমনি অবিচ্ছিন্ন ভীরুতা,—এই দুইই যদি সে খর্ব করে থাকে মা, বেণীর কথা মনে করে আমি কোনদিন দীর্ঘশ্বাস ফেলব না। বরঞ্চ এই প্রার্থনাই করব, সে আবার ফিরে এসে দীর্ঘজীবী হয়ে যেন এমনি কোরেই কাজ করতে পারে। রমা, এক সন্তান যে কি সে শুধু মায়েই জানে। বেণীকে যখন তারা রক্তমাখা অবস্থায় পালকিতে করে হাসপাতালে নিয়ে গেল, তখন যে আমার কি হয়েছিল তোমাকে বোঝাতে পারব না। কিন্তু তবুও কারুকে আমি অভিশাপ দিতে পারিনি। এ কথা ত ভুলতে পারিনি মা, যে, ধর্মের শাসন মায়ের মুখ চেয়ে থাকে না।

রমা। তোমার সঙ্গে তর্ক করচি নে জ্যাঠাইমা, কিন্তু এই যদি সত্যি হয়, তবে রমেশদা কোন্ পাপে এ দুঃখ ভোগ করচেন? আমরা যা কোরে তাঁকে জেলে দিয়েছি এ কথা ত কারও অগোচর নেই।

বিশ্বেশ্বরী। নেই বলেই ত বেণী আজ হাসপাতালে। আর তোমার—কি জানিস মা, কোন কাজই কোনদিন শুধু শুধু শূন্যে মিলিয়ে যায় না। তার শক্তি কোথাও-না-কোথাও গিয়ে কাজ করেই। কিন্তু কি কোরে করে তা সকল সময় ধরা পড়ে না বলেই আজ পর্যন্ত এ সমস্যার মীমাংসা হোলো না, কেন একের পাপে অন্যে প্রায়শ্চিত্ত করে। কিন্তু করতে যে হয় রমা, তাতে ত সংশয় নেই।

[রমা নীরবে দীর্ঘশ্বাস মোচন করিল]

বিশ্বেশ্বরী। এর থেকে আমারও চোখ ফুটেচে মা, ভাল করব বললেই সংসারে ভাল করা যায় না। গোড়ার ছোট–বড় অনেকগুলো সিঁড়ি উত্তীর্ণ হবার ধৈর্য থাকা চাই। একদিন রমেশ হতাশ হয়ে যখন চলে যেতে চেয়েছিল তখন আমিই যেন তাকে যেতে দিইনি। তাই তার জেলের খবর শুনে মনে হয়েছিল আমিই যেন তাকে জেলে পাঠালাম। তখন ত জানিনি মা,–বাইরে থেকে ছুটে এসে ভাল করতে যাওয়ার বিড়ম্বনা এত। সে কাজ এত কঠিন।

রমা। কেন জ্যাঠাইমা?

বিশ্বেশ্বরী। আগে যে দেশের সঙ্গে এক হয়ে মিলতে হয়, সে কথা ত তখনও মনেও ভাবিনি। প্রথম থেকেই সে তার মস্ত জোর, মস্ত প্রাণ নিয়ে এতই উঁচুতে এসে দাঁড়াল যে কেউ তার নাগালই পেলে না। কিন্তু এখন ভাবি তাকে নাবিয়ে এনে ভগবান মঙ্গল করেছেন।

রমা। ভগবান নয় জ্যাঠাইমা–আমরা। কিন্তু আমাদের অধর্ম তাঁকে কেন নাবিয়ে আনবে?

বিশ্বেশ্বরী। আনবে বৈ কি মা, নইলে পাপ আর এত ভয়ঙ্কর কেন? উপকারের প্রত্যুপকার কেউ যদি না-ই করে, এমন কি উলটে অপকার করে, তাতেই বা কি আসে-যায় মা, মানুষের কৃতঘ্নতায় যদি না দাতাকে নাবিয়ে আনে। তুই বলচিস রমা, কিন্তু তোদের গ্রাম কি আর রমেশকে ঠিক তেমনিটি ফিরে পাবে? তোরা স্পষ্ট দেখতে পাবি, সে যে হাত দিয়ে দশের কল্যাণ করে বেড়াত, তার সেই হাতটাই ভৈরব আচায্যি–আর একা ভৈরব কেন, তোদের সবাই মিলে মুচড়ে ভেঙ্গে দিয়েচে। কে জানে, হয়ত ভালই হয়েচে। তার বলিষ্ঠ সমগ্র হাতের অপর্যাপ্ত দান গ্রহণ করবার শক্তি যখন লোকের ছিল না, তখন এই ভাঙ্গা হাতটাই তাদের সত্যিকার কাজে লাগবে।

[এই বলিয়া তিনি গভীর নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। তাঁহার হাতখানি রমা নীরবে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করিয়া নিজেও দীর্ঘশ্বাস মোচন করিল]

রমা। জ্যাঠাইমা?

বিশ্বেশ্বরী। কেন মা?

রমা। লাঞ্ছনা-গঞ্জনা আর আমার গায়ে লাগে না, মা। মিথ্যে সাক্ষী দিয়ে যেদিন তাঁকে জেলে দিয়েচি, সেদিন থেকে জগতে সমস্ত ব্যথা কেবল পরিহাস হয়ে গেছে।

বিশ্বেশ্বরী। এমনিই হয় মা।

রমা। সকলে বলতে লাগলেন শত্রুকে যেমন কোরে হোক নিপাত করতে দোষ নেই। তাঁরা তাই করেচেন। কিন্তু, আমার ত সে কৈফিয়ত নেই জ্যাঠাইমা!

বিশ্বেশ্বরী। তোমারই বা নেই কেন?

রমা। না মা, নেই।—একটা কথা আজ তোমার কাছে স্বীকার করব জ্যাঠাইমা। মোড়লদের বাড়িতে ছেলেরা জড় হয়ে রমেশদার কথামত সৎ আলোচনাই করত।

বদমাইশের দল ব'লে তাদের পুলিশে ধরিয়ে দেবার একটা মতলব চলছিল। আমি লোক পাঠিয়ে তাদের সাবধান করে দিই। কারণ, পুলিশ ত এই চায়। একবার তাদের হাতে পেলে ত আর রক্ষে রাখত না।

বিশ্বেশ্বরী। (শিহরিয়া) বলিস কি রে? নিজের গ্রামের মধ্যে পুলিশের উৎপাত বেণী মিথ্যে কোরে ডেকে আনতে চেয়েছিল?

রমা। মনে হয় বড়দার এই শাস্তি তারই ফল। আমাকে মাপ করতে পারবে জ্যাঠাইমা?

বিশ্বেশ্বরী। তার মা হয়ে এ যদি না ক্ষমা করতে পারি, কে পারবে রমা? আমি আশীর্বাদ করি এর পুরস্কার ভগবান তোমাকে যেন দেন।

রমা। (হাত দিয়া অশ্রু মুছিয়া ফেলিল) আমার এই একটা সান্ত্বনা, তিনি ফিরে এসে দেখবেন তাঁর আনন্দের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়ে আছে। যা তিনি চেয়েছিলেন, তাঁর সেই দেশের দীন-দুঃখীরা এবার ঘুম ভেঙ্গে উঠে বসেচে। তাঁকে চিনেচে, তাঁকে ভালোবেসেচে। এই ভালবাসার আনন্দে আমার অপরাধ কি তিনি ভুলতে পারবেন না?—জ্যাঠাইমা, শুধু একটি জায়গায় আমরা দূরে যেতে পারিনি। তোমাকে আমরা দু'জনেই ভালোবেসেছিলাম।

[বিশ্বেশ্বরী নিঃশব্দে তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া চুম্বন করিলেন]

রমা। সেই জোরে একটি দাবী তোমার কাছে আজ রেখে যাব। যখন আমি আর থাকব না, তখনও যদি আমাকে তিনি ক্ষমা করতে না পারেন, শুধু এই কথাটি আমার হয়ে তাঁকে বোলো, যত মন্দ বলে আমাকে তিনি জানতেন, তত মন্দ আমি ছিলাম না। আর যত দুঃখ তাঁকে দিয়েচি, তার অনেক বেশী দুঃখ যে আমি নিজেও সয়েচি,—তোমার মুখের এই কথাটি হয়ত তিনি অবিশ্বাস করবেন না।

বিশ্বেশ্বরী। তবে, চল মা আমরা কোন তীর্থস্থানে গিয়ে থাকি। যেখানে রমেশ নেই, বেণী নেই, যেখানে চোখ তুললেই ভগবানের মন্দিরের চুড়ো চোখে পড়ে, সেইখানেই যাই। আমি সমস্ত বুঝতে পেরেচি রমা। যদি যাবার দিনই তোর এগিয়ে এসে থাকে মা, তবে এ বিষ বুকের মধ্যে নিয়ে আর যাব না—সমস্ত এইখানেই নিঃশেষ করে ফেলে রেখে যাব। কেমন, পারবি ত মা?

রমা। (বিশ্বেশ্বরীর জানুর উপর মুখ লুকাইয়া আকুল হইয়া কাঁদিয়া ফেলিল, কহিল) আমি আর পারিনে জ্যাঠাইমা, আমাকে এখান থেকে তুমি নিয়ে চল।

চতুর্থ দৃশ্য

কারা- প্রাচীরের সম্মুখের পথ

[এক দিক দিয়া রমেশ প্রবেশ করিল ও অপর দিক দিয়া বেণী—তাহার মাথায় ব্যান্ডেজ বাঁধা—স্কুলের হেডমাস্টার বনমালী ও কয়েকজন ছাত্র। পশ্চাতে বেণীর অনুগত আরও দুই—চারিজন লোক]

বেণী। (রমেশকে আলিঙ্গন করিয়া) রমেশ, ভাই রে, নাড়ীর টান যে এমন টান এবার তা টের পেয়েচি। রমা যে আচায্যি হারামজাদাকে হাত কোরে এত শত্রুতা করবে, লজ্জা-শরমের মাথা খেয়ে নিজে এসে মিথ্যে সাক্ষী দিয়ে এত দুঃখ দেবে, সে কথা জেনেও যে জানিনি, ভগবান তার শাস্তি আমাকে দিয়েচেন। জেলের মধ্যে তুই বরং ছিলি ভাল ভাই, বাইরে থেকে এই ক'টা মাস আমি যে তুষের আগুনে জ্বলে-পুড়ে গেছি।

[রমেশ হতবুদ্ধির মত কি যে করিবে ভাবিয়া পাইল না।
বনমালী ও ছেলেরা অগ্রসর হইয়া তাহার পায়ের ধূলা লইল]

বেণী। (কাঁদিয়া ফেলিয়া) দাদার ওপর অভিমান রাখিস নে ভাই, বাড়ি চল্। মা কেঁদে কেঁদে দু'চক্ষু অন্ধ করবার যোগাড় করেচেন। আমরা শুধু প্রাণে বেঁচে আছি রমেশ।

রমেশ। (বেণীর মাথার ব্যান্ডেজটা হাত দিয়া দেখাইয়া) এ কি বড়দা, মাথা ভাঙলো কি করে?

বেণী। শুনে আর কি হবে ভাই, আমি কাউকে দোষ দিইনে। এ আমার নিজেরই কর্মফল,—আমারই পাপের শাস্তি।—জানিস ত রমেশ, এই আমার জন্মগত দোষ যে মনে এক, মুখে আর কিছুতে করতে পারিনে। মনের ভাব আর পাঁচজনের মত ঢেকে রাখতে

পারিনে বলে কত শাস্তিই যে ভোগ করতে হয়,—কিন্তু তবু ত আমার চৈতন্য হয় না। দোষের মধ্যে সেদিন কাঁদতে কাঁদতে বলে ফেলেছিলাম, রমা, আমরা তোর কাছে কি অপরাধ করেচি যে ভাইকে আমার জেলে দিলি! জেল হয়েচে শুনলে মা যে একেবারে প্রাণ বিসর্জন করবেন। আমরা ভায়ে ভায়ে সম্পত্তি নিয়ে ঝগড়া করি, যা করি, তবু ত সে আমার ভাই। তুই একটি আঘাতে আমার ভাইকে মারলি,—আমার মাকে মারলি!—রমেশ, সেদিন রমার সে উগ্রমূর্তি মনে হলে আজও হৃদ্‌কম্প হয়। বললে, রমেশের বাপ আমার বাপকে জেলে দিতে যায়নি? পারলে ছেড়ে দিত বুঝি?

রমেশ। হাঁ, রমার মাসীর মুখেও একথা শুনছিলাম।

বেণী। এই হোলো তার জাতক্রোধ। কিন্তু মেয়েমানুষের এত দর্প আমারও সহ্য হল না। আমিও রেগে বলে ফেললাম, আচ্ছা, ফিরে আসুক সে, তার পরে এর বিচার হবে। কিন্তু খুন করা যে তার অভ্যেস ভাই। তোমাকে খুন করতে আকবর লেঠেলকে পাঠিয়েছিল মনে নেই? কিন্তু তোমার কাছে ত চালাকি খাটেনি—তুমিই উলটে শিখিয়ে দিয়েছিলে! কিন্তু আমাকে খুন করা আর শক্ত কি?

রমেশ। তার পরে?

বেণী। তার পরে কি আর মনে আছে ভাই? কে কিসে করে যে আমাকে হাসপাতালে নিয়ে গেল, সেখানে কি হল, কে দেখলে কিছুই জানিনে। এ যাত্রা যে রক্ষে পেয়েচি সে কেবল মায়ের পুণ্যে। এমন মা কি আর আছে রমেশ!

[রমেশের মুখে ও মনের মধ্যে কত কি যে হইতে লাগিল
তাহার নির্দেশ নাই,—কিন্তু সে একটা কথাও কহিল না]

বেণী। গাড়ি তৈরি ভাই। আর দেরি নয়,—বাড়ি চল্। মায়ের কাছে তোরে একবার পৌঁছে দিয়ে আমি বাঁচি।

রমেশ। চলুন। জেলের মধ্যেই শুনেছিলাম রমা নাকি বড় পীড়িত?

বেণী। ভগবানের দণ্ড রমেশ—এ যে তাঁরই রাজ্য, এ কি সবাই মনে রাখে? জগদীশ্বর! চল ভাই, ঘরে চল।

[সকলের প্রস্থান]

পঞ্চম দৃশ্য

রমার কক্ষ

[রমেশ প্রবেশ করিয়া রমাকে দেখিয়া চমকিয়া গেল]

রমেশ। তোমার এত অসুখ করেচে তা ত আমি ভাবিনি!

[রমা শয্যা হইতে কোনমতে উঠিয়া রমেশের পায়ের কাছে প্রণাম করিল]

রমেশ। এখন কেমন আছ রানী?

রমা। আমাকে আপনি রমা বলেই ডাকবেন।

রমেশ। বেশ তাই। শুনেছিলাম তুমি অসুস্থ ছিলে। এখন কেমন আছ এই খবরটাই জানতে চাচ্ছিলাম। নইলে, নাম তোমার যাই হোক, সে ধরে ডাকবার আমার ইচ্ছেও নেই, আবশ্যকও নেই।

রমা। এখন আমি ভাল আছি। আমি ডেকে পাঠিয়েচি বলে আপনি হয়ত খুব আশ্চর্য হয়েচেন, কিন্তু—

রমেশ। না, হইনি। তোমার কোন কাজে আশ্চর্য হবার দিন আমার কেটে গেছে। কিন্তু ডেকে পাঠিয়েচ কেন শুনি?

রমা। (ক্ষণকাল অধোমুখে নিরুত্তর হইয়া থাকিয়া) রমেশদা, আজ দুটি কাজের জন্যে তোমাকে কষ্ট দিয়ে ডেকে এনেচি। কত যে অপরাধ করেচি সে ত জানি, তবুও

আমি নিশ্চয় জানতাম তুমি আসবেই। আর আমার এই শেষ অনুরোধ-দুটিও অস্বীকার করবে না।

[বলিতে বলিতে অশ্রুভারে গলা তাহার ভাঙ্গিয়া আসিল]

রমেশ। কি তোমার অনুরোধ?

রমা। (চকিতের ন্যায় মুখ তুলিয়াই পুনরায় আনত করিল) পীরপুরের যে বিষয়টা বড়দা তোমার সাহায্যে দখল করতে চাচ্ছেন সেটা আমার নিজের। বাবা বিশেষ করে আমাকেই সেটা দিয়ে গেছেন। তার পোনর-আনা আমার, এক আনা তোমাদের। সেইটেই তোমাকে আমি দিয়ে যেতে চাই।

রমেশ। তোমার ভয় নেই, বড়দা যাই কেন না আমাকে বলুন, আমি চুরি করতে পূর্বেও কখনো কাউকে সাহায্য করিনি, এখনো করব না। আর যদি দান করতেই চাও, তার জন্যে অন্য লোক আছে। আমি দান গ্রহণ করিনে।

রমা। আমি জানি রমেশদা, তুমি চুরি করতে সাহায্য করবে না। আর নিলেও যে তুমি নিজের জন্যে নেবে না সেও আমি জানি। কিন্তু তা ত নয়। দোষ করলে শাস্তি হয়। আমি যত অপরাধ করেচি, এটা তারই দণ্ড বলে কেন গ্রহণ কর না?

রমেশ। তোমার দ্বিতীয় অনুরোধ?

রমা। আমার যতীনকে আমি তোমার হাতে দিয়ে গেলাম—

রমেশ। দিয়ে গেলাম মানে?

রমা। (রমেশের মুখের প্রতি চাহিয়া) একদিন কোন মানেই তোমার কাছে গোপন থাকবে না রমেশদা,—তাই, আমার যতীনকে আমি তোমাকেই দিয়ে যাব। তাকে তোমার মত করেই মানুষ কোরো। বড় হয়ে সে যেন তোমারি মত স্বার্থত্যাগ করতে পারে। (আঁচলে চোখ মুছিয়া) এ আমার চোখে দেখে যাবার সময় হবে না। কিন্তু শেখালে হয়ত সেও একদিন তোমারি মত মাথা উঁচু কোরে দাঁড়াবে।

[রমেশ চুপ করিয়া রহিল]

রমা। চুপ কোরে থাকলে ত আজ তোমাকে ছাড়ব না রমেশদা।

রমেশ। দেখ, এ-সকলের মধ্যে আর আমাকে টেনো না। আমি অনেক দুঃখের পরে একটুখানি আলোর শিখা জ্বালতে পেরেচি, তাই কেবলই ভয় হয়, পাছে একটুতেই তা নিবে যায়।

রমা। তোমার ভয় নেই রমেশদা, এ আলো আর নিববে না। জ্যাঠাইমা বলছিলেন, তুমি দূর থেকে এসে বড় উঁচুতে বসে কাজ করতে চেয়েছিলে বলেই এত বাধা পেয়েচ।তখন পরের মত তুমি গ্রাম্য-সমাজের অতীত ছিলে, এখন হয়েচ তাদেরই একজন। তখন তোমার দেওয়া ছিল বিদেশীর দান, আজ হয়েচে তা আত্মীয়ের স্নেহের উপহার। দুঃখ পেয়ে দুঃখ সয়ে সে তুমি আর নেই। তাই এ আলো আর ম্লান হবে না,—এখন প্রতিদিনই উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।

রমেশ। ঠিক জান রমা, আমার এই দীপের শিখাটুকু আর নিববে না?

রমা। ঠিক জানি। যিনি সব জানেন, এ সেই জ্যাঠাইমার কথা। এ কাজ তোমারি। আমার যতীনকে তুমি হাতে তুলে নিয়ে, আমার সকল অপরাধ ক্ষমা কোরে, আজ আশীর্বাদ কর যেন নিশ্চিন্ত হয়ে আমি যেতে পারি।

রমেশ। কিন্তু যাবার কথাই বা তুমি কেন ভাবচ রমা,—আমি বলচি তুমি আবার ভাল হয়ে যাবে।

রমা। ভাল হবার কথা ত ভাবচি নে রমেশদা, শুধু ভাবচি আমার যাবার কথা। কিন্তু আরও একটি অনুরোধ তোমাকে রাখতে হবে। আমার কথা নিয়ে বড়দার সঙ্গে তুমি কোনদিন বিবাদ করো না।

রমেশ। এ কথার মানে?

রমা। মানে যদি কখনো শুনতে পাও, সেদিন কেবল এই কথাটি মনে কোরো, আমি কেমন কোরে নিঃশব্দে সহ্য করে চলে গেছি—একটি কথারও প্রতিবাদ করিনি। একদিন যখন অসহ্য মনে হয়েছিল, সেদিন জ্যাঠাইমা এসে বলেছিলেন,—মা, মিথ্যেকে ঘাঁটাঘাঁটি করে জাগিয়ে তুললেই তার পরমায়ু বেড়ে ওঠে। নিজের অসহিষ্ণুতায় তার আয়ু বাড়িয়ে তোলার মত পাপ আর নেই। তাঁর এই উপদেশটি তুমিও কখনো ভুলো না রমেশদা।

[রমেশ নীরবে তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল]

রমা। আজ আমাকে তুমি ক্ষমা করতে পারচ না ভেবে দুঃখ পেয়ো না রমেশদা। আমি ঠিক জানি আজ যা কঠিন মনে হচ্ছে, একদিন তাই সোজা হয়ে যাবে। সেদিন আমার সকল অপরাধ তুমি সহজেই ক্ষমা করবে জেনে মনের মধ্যে আর আমার ক্লেশ নেই।—কাল সকালেই আমি যাচ্চি।

রমেশ। কাল সকালেই? কোথায় যাবে কাল?

রমা। জ্যাঠাইমা যেখানে নিয়ে যাবেন আমি সেইখানেই যাব।

রমেশ। কিন্তু তিনি ত আর আসবেন না শুনচি।

রমা। আমিও না। আমিও তোমার পায়ে আজ জন্মের মতই বিদায় নিলাম।

[এই বলিয়া রমা মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিল]

রমেশ। আচ্ছা যাও। কিন্তু অকস্মাৎ কেন বিদায় নিলে তাও কি জানতে পারব না?

[রমা মৌন হইয়া রহিল]

রমেশ। কেন যে তোমার সমস্ত কথাই লুকিয়ে রেখে চলে গেলে সে তুমিই জান। কিন্তু আমিও কায়মনে প্রার্থনা করি, একদিন যেন তোমাকে সর্বান্তঃকরণে ক্ষমা করতে পারি। তোমাকে ক্ষমা করতে না পারায় যে আমার কি ব্যথা, সে শুধু আমিই জানি।

[এই সময়ে বিশ্বেশ্বরী প্রবেশ করিয়া ডাকিলেন–]

বিশ্বেশ্বরী। রমা!

রমেশ। জ্যাঠাইমা! কি অপরাধে আমাদের এত শীঘ্র ত্যাগ করে চললে?

বিশ্বেশ্বরী। অপরাধ? অপরাধের কথা বলতে গেলে ত শেষ হবে না বাবা। তাতে কাজ নেই। কিন্তু আমার নিজের কথাটা তুই জেনে রাখ্। এখানে যদি মরি রমেশ, বেণী আমার মুখে আগুন দেবে। সে হলে ত মুক্তি পাব না বাবা। ইহকালটা ত জ্বলে-জ্বলেই গেল, পাছে পরকালটাও এমনি জ্বলে-পুড়ে মরি, আমি সেই ভয়েই পালাচ্চি রমেশ।

রমেশ। জ্যাঠাইমা, ছেলের অপরাধ যে তোমার বুকে এমন কোরে বেজেছিল সে ত কোনদিন জানতে দাওনি? কিন্তু সমস্ত ছেড়ে রমা কেন বিদায় নিতে চায়? তাকে তুমি কোথায় নিয়ে যাবে?

রমা। আমি আসচি জ্যাঠাইমা।

[প্রস্থান]

বিশ্বেশ্বরী। জিজ্ঞেসা করছিলি রমা কেন বিদায় নিতে চায়? কোথায় তাকে আমি নিয়ে যেতে চাই? সংসারে আর তার স্থান হোল না রমেশ, তাই তাকে এবার ভগবানের পায়ের নীচে নিয়ে যাব। সেখানে গিয়েও সে বাঁচে কিনা জানিনে, কিন্তু যদি বাঁচে, বাকি জীবনটা এই অতি-কঠিন প্রশ্নের মীমাংসা করতে বলব, কেন ভগবান তাকে এত রূপ, এত গুণ, এতবড় একটা মহাপ্রাণ দিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন, আর কেনই বা বিনা দোষে দুঃখের বোঝা মাথায় দিয়ে আবার সংসারের বাইরে ফেলে দিলেন। এ কি তাঁরই অভিপ্রায়, না এ শুধু আমাদের সমাজের খেয়ালের খেলা! ওরে রমেশ, তার মত দুঃখিনী বুঝি আর পৃথিবীতে নেই।

[বলিতে বলিতে তাঁহার গলা ভাঙ্গিয়া পড়িল। রমেশ নীরবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল]

বিশ্বেশ্বরী। কিন্তু তোর ওপর আমার এই আদেশ রইল রমেশ, তাকে যেন তুই ভুল বুঝিস নে। যাবার সময় আমি কারও বিরুদ্ধে কোন নালিশ করে যেতে চাইনে, শুধু এই কথাটা আমার তুই ভুলেও কখনো অবিশ্বাস করিস নে যে, তার বড় মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিনী তোর আর নেই।

রমেশ। কিন্তু জ্যাঠাইমা

বিশ্বেশ্বরী। এর মধ্যে কোন ‘কিন্তু’ নেই রমেশ। তুই যা শুনেচিস সব মিথ্যে, যা জেনেচিস সব ভুল, কিন্তু এ অভিযোগের এইখানেই যেন শেষ হয়। তোর কল্যাণের কাজ যেন বন্যার মত সমস্ত দ্বেষ-হিংসা ভাসিয়ে নিয়ে বয়ে যেতে পারে, তোর ওপর এই তার

শেষ প্রার্থনা। এই জন্যেই সে মুখ বুজে সমস্ত সহ্য করেছে। প্রাণ দিতে বসেচে রমেশ, তবু কথা কয়নি।

রমেশ। তাকে বোলো জ্যাঠাইমা—

বিশ্বেশ্বরী। পারিস ত নিজেই তাকে বলিস রমেশ, আমার আর সময় নেই।

[প্রস্থান]

[যতীনকে সঙ্গে লইয়া রমা প্রবেশ করিল। তাহার পরিধানে
দূরে বাহিরে যাইবার পরিচ্ছদ]

রমেশ। (সবিস্ময়ে) এ কি! এত রাত্রে এ বেশ কেন?

রমা। যাত্রা করে বেরিয়ে এলাম রমেশদা, রাত আর নেই। যাবার আগে দুটি কাজ বাকী ছিল। এক তোমার শেষ পায়ের ধুলো নেওয়া, আর যতীনকে তোমার হাতে তুলে দেওয়া।

রমেশ। এ ভার আমাকেই দিয়ে যাবে রমা?

রমা। রমা ত নয়,—রানী। তার সবচেয়ে আদরের ধন এই ছোট ভাইটি। তাকে তুমি ছাড়া আর কে নিতে পারে রমেশদা?

রমেশ। কিন্তু এর কতবড় দায়িত্ব—এ অনুরোধ রমা—

রমা। এখনো রমা—? কিন্তু এ ত অনুরোধ নয়, এ তার দাবী! এই দাবী নিয়েই সে সংসারে একদিন এসেছিল, এই দাবী নিয়েই সে সংসার থেকে যাবে। এ দাবীর ত অন্ত নেই রমেশদা,—একে তুমি ফাঁকি দেবে কি কোরে? এই নাও।

[এই বলিয়া সে যতীনকে তাহার হাতে দিয়া
পায়ের নীচে গড় হইয়া প্রণাম করিল]